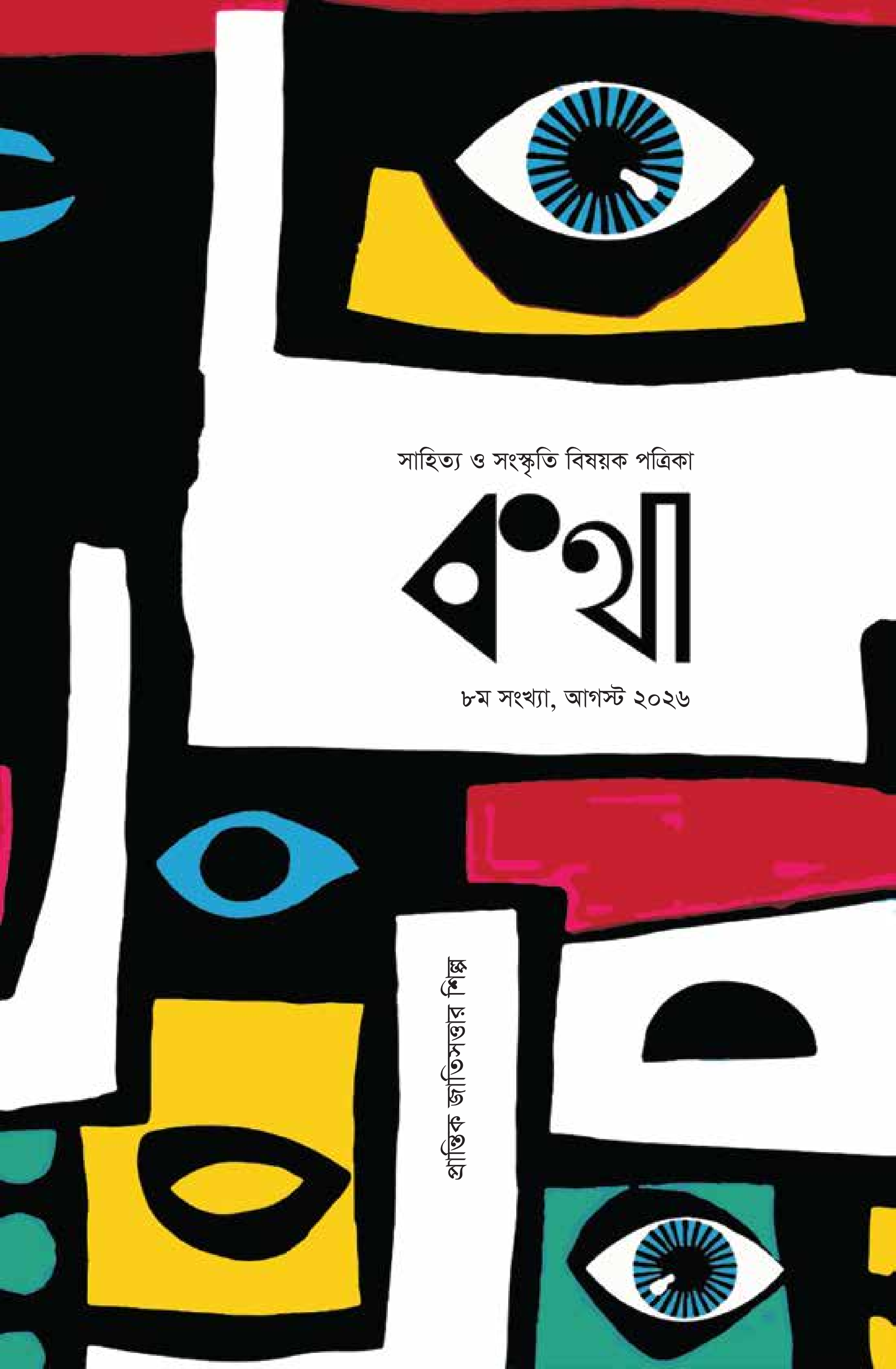

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

কথা

৮ম সংখ্যা, আগস্ট ২০২৬

প্রান্তিক জাতিসত্তার শিল্প

কথা

প্রান্তিক জাতিসত্তার শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

৮ম সংখ্যা
আগস্ট ২০২৬

সম্পাদক
হামোম প্রমোদ

সহযোগী সম্পাদক
ওয়াই চন্দ্রজিৎ, য়েনশম্বম ললিত মোহন

প্রচ্ছদ
নির্ঝর নৈঃশব্দ্য

শুভেচ্ছা মূল্য
৳-২০০ / $-10

যোগাযোগ
2227 Rue Dollard, Longueuil, Quebec, J4K 4P1, Canada.
Email: kathebd@gmail.com
WhatsApp - 15145278032

সম্পাদক কর্তৃক থকবিরিম প্রকাশনী ১৯/৪/এ মণিপুরিপাড়া, ফার্মগেট
ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং ডায়নামিক প্রেস, কাঁটাবন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত

সূচিপত্র

প্রবন্ধ

০৫ । **রতন থিয়াম ও মণিপুরের নাট্য আন্দোলন**
এল বীরমঙ্গল সিংহ

১৪ । **আদিবাসীদের রক্ত ডাকাতি**
পাভেল পার্থ

৩৩ । **নুপি লান; মণিপুরে নারীপ্রতিবাদের রাজনৈতিক রূপান্তর ও মৈতৈ পাঙাল নারীরা**
হামোম প্রমোদ

৪২ । **ওয়ানগালা উৎসব বাংলাদেশি গারোদের চেতনার আকর**
বাঁধন আরেং

৫১ । **সবুজ অরণ্যে মহাপুরম জন্মভূমি সন্তান: চিত্ত কিশোর চাকমা**
ইন্টু মনি তালুকদার

৫৪ । **চাকমা নৃগোষ্ঠী: সুলুক সন্ধানে**
তৌফিকুল ইসলাম চৌধুরী

৬১ । **বাংলাদেশের আদিবাসী সাহিত্য বিষয়ক মাসব্যাপী ভার্চুয়াল আলোচনা**

গল্প

৭০ । **হারিয়ে যাওয়া সম্পর্ক**
থোকচোম কেনাহান দেবী

৭৩ । **শেকল**
নোংথোম্বম কুঞ্জমোহন

কবিতা

৮০ । **মণিপুরি ভাষার কবিতা-** সনাতন হামোম
৮১ । **নিঃসঙ্গতা-** পরাগ রিছিল
৮২ । **শালবনে লেখা কবিতা-** মিঠুন রাকসাম
৮৪ । **অগ্রসর অশ্বনগরে-** সুজালো যশ
৮৫ । **জীবন অথবা যুদ্ধ-** লেবিসন স্কু
৮৭ । **প্রেমের কবিতা-** অনিরুদ্ধ দিলওয়ার
৮৮ । **চাকমা ভাষার কবিতা-** আর্য্যমিত্র চাকমা

কর্মশালা

৯২ । **আদিবাসী লেখকদের সাহিত্যচর্চা বিকাশে কর্মশালা**

গ্রন্থালোচনা

৯৪ । **রান্নাঘরের নৃ-তত্ত্ব ও কৃষ্টির রসায়ন: গারো জাতির পানীয় ও খাদ্য বৈচিত্র্য**
তৃপ্ত মানখিন

স ম্পা দ কী য়

বাংলাদেশের বহুভাষিক সাহিত্য কেবল বাংলা সাহিত্যিক ঐতিহ্যের কোনো সম্প্রসারিত অনুলিপি বা সাধারণ অনুকরণ নয়। এটি কালক্রমে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল এক স্বতন্ত্র বহুভাষিক সাহিত্যিক বলয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। এই সাহিত্যিক পরিসরে সৃজনশীল প্রকাশের মধ্য দিয়ে স্ব স্ব মাতৃভাষার স্থান, আত্মপরিচয়, সাংস্কৃতিক অতীত, অধিকারবোধ, বহুভাষিকতা, যৌথ স্মৃতি ও মাতৃভূমির রূপকল্পগুলো প্রতিনিয়ত আলোচিত, বিশ্লেষিত ও পুনর্সংজ্ঞায়িত হচ্ছে। নিজস্ব জাতিসত্তার ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে গভীর শেকড় প্রোথিত রেখেও এই সাহিত্য বাংলাদেশের জাতিগত ও ভাষিক সংখ্যালঘুদের জীবনবাস্তবতাকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রতিফলিত করে; যার ফলে গড়ে উঠছে বাংলাদেশের আন্তঃভাষিক সাহিত্যের এক অনন্য বিন্যাস।

বাংলাদেশের প্রান্তিক জাতিসত্তা বা আদিবাসী সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- সৃজনশীল প্রকাশের বাহন হিসেবে মাতৃভাষার নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহার। বহু আদিবাসী সাহিত্যিকের কাছে পূর্বপুরুষদের ভাষায় সাহিত্যচর্চা কেবল ঐতিহ্য রক্ষার তাগিদ নয়, বরং তা স্বকীয় সত্তা ও পরিচিতি নির্মাণের এক সক্রিয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়াস। আর এ সাহিত্যের একটি বিশেষ দিক হলো, এখানকার অধিকাংশ লেখক একই সঙ্গে কবি, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক, সম্পাদক, গবেষক, সংগঠক ও সাংস্কৃতিক কর্মীর বহুমুখী ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের সাহিত্যিক অবদান কেবল পুস্তক প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং স্ব স্ব মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ, বিকাশ এবং পুনরুজ্জীবনের নানা সামাজিক কর্মকাণ্ডেও সমানভাবে বিস্তৃত। বাংলাদেশের এই বহুভাষিক সাহিত্য-সমাজ কেবল একমুখী লেখালেখির ওপর ভর করে বেঁচে নেই; বরং সম্পাদনাকর্ম, অনুবাদ, প্রকাশনা, নবীনদের দিকনির্দেশনা প্রদান, সাংস্কৃতিক সংগঠন পরিচালনা এবং সামাজিক সেবার যৌথ ও যৌথতার প্রয়াসে টিকে রয়েছে।

তাছাড়া আদিবাসী লেখকদের আরেকটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তাঁদের সহজ বহুভাষিকতা। তাঁরা কেবল নিজস্ব মাতৃভাষাতেই আবদ্ধ থাকেন না, বরং বাংলা ও ইংরেজি ভাষাতেও সমান দক্ষতায় সাহিত্য রচনা করে থাকেন। এই বহুভাষিক সাহিত্যচর্চা একদিকে যেমন মাতৃভাষার প্রাণশক্তি অক্ষুণ্ন রাখছে, অন্যদিকে তেমনি আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ ও মেলবন্ধনকেও সুদৃঢ় করছে।

বলা বাহুল্য, বাংলাদেশের বহুভাষিক সমকালীন সাহিত্য উৎপাদনের চর্চা আজ আর কেবল মুদ্রিত বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ নেই। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, অনলাইন সাহিত্য ফোরাম, বহুভাষিক সাময়িকী এবং স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাণ ও থিয়েটারসহ উদীয়মান নানা মাধ্যম নতুন প্রজন্মের কাছে সাহিত্যিক ও শৈল্পিক প্রকাশের ক্ষেত্রকে বহুগুণ প্রসারিত করেছে। এই রূপান্তরগুলো স্পষ্ট নির্দেশ করে যে, বাংলাদেশের প্রান্তিক জাতিসত্তা তথা আদিবাসী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগগুলো আজ এক বৃহত্তর বহুমাত্রিক সৃজনশীল আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে। এ দেশের আদিবাসী সাহিত্য কেবল শৈল্পিক প্রকাশের বাহন নয়- বরং তা সাহিত্যের চেনা সীমানা ছাড়িয়ে ভাষা রক্ষা, যৌথ স্মৃতি উদযাপন এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় টিকিয়ে রাখার এক শক্তিশালী অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে।

বাংলাদেশের আদিবাসী সাহিত্যিকদের সৃজনশীল রচনা, গবেষণা, আদিবাসী ও সংখ্যালঘু ভাষা সংক্রান্ত অনুসন্ধান এবং তুলনামূলক সাহিত্যের বৈশ্বিক আঙিনায় বাংলাদেশের এই বহুভাষিক সাহিত্য আরও গভীর অনুরাগের সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ স্বীকৃতির দাবি রাখে। ভবিষ্যতে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, অধিকতর গবেষণা, অনুবাদ এবং নথিবদ্ধকরণের (documentation) উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হলে, এ সাহিত্য বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় সাহিত্য-ভূদৃশ্যে এক গৌরবময় স্থান অধিকার করবে এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশের সামগ্রিক সাহিত্যের ইতিহাসকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করবে।

রতন থিয়াম ও মণিপুরের নাট্য আন্দোলন

এল বীরমঙ্গল সিংহ

পাহাড় ঘেরা উত্তর-পূর্বের ছোট্ট রাজ্য মণিপুরের রয়েছে নৃত্যকলার এক গৌরবময় ঐতিহ্য। যেমন লোকগীতি, লোকনৃত্য, মার্শাল আর্ট, ধ্রুপদী নৃত্য, নটসংকীর্তন ইত্যাদির এক সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য। তবে ভারতের অন্য রাজ্যগুলোর তুলনায় মণিপুরে অনেক দেরিতে শুরু হয়েছিল আধুনিক নাট্যচর্চা। বলাবাহুল্য, ভারতের প্রথম আধুনিক নাট্যচর্চা শুরু হয়েছিল কলিকাতায় ইংরেজদের প্রভাবে। ১৭৯৫ সালে গেরাসিম লেবেদেফ ইংরেজি নাটক 'The Disguise' বাংলায় অনুবাদ করে স্থানীয় নাট্যমোদীদের দিয়ে প্রথম কলিকাতায় বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন। তার ১০৭ বছর পর ১৯০২ সালে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে প্রথম 'প্রভাস মিলন' নাটক মঞ্চস্থ হয়। ইম্ফলের বাবুপাড়ায় বসবাসকারী বাঙালিবাবুদের উদ্যোগে মণিপুরের রাজা চূড়াচান্দ মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতায় গোবিন্দজির নাটমণ্ডপে অস্থায়ী মঞ্চ বানিয়ে বাংলা ভাষায় বাঙালি ও মণিপুরি কলাকুশলীরা এই নাটকে অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন। তারপর ১৯০৩ সালে বাঙালি অধ্যুষিত বাবুপাড়ায় বামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের বাসগৃহে বামাচরণ মুখোপাধ্যায় বান্ধব নাট্যশালা নামে একটি থিয়েটার হল তৈরি করা হয়। আর, নাট্যসংস্থার নাম রাখা হয় বান্ধব নাট্যসমাজ। এই নাট্যসংস্থার বাঙালি ও মণিপুরি কলাকুশলীদের সম্মিলিত প্রয়াসে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত নাটক 'মেবার পতন' মঞ্চস্থ করা হয়। এ প্রসঙ্গে সুকুমার বাগচি মহোদয় তাঁর 'Bengali theatre in Manipur' প্রবন্ধে লেখেন, "The first drama played in Manipur was a Bengali drama 'প্রভাস মিলন'. It was played in 1902 in the courtyard of Shree Govindaji temple adjacent to the Royal Palace of the then Maharaja Sir Churachand Singh, K.C.S.I, C.B.E. who was the chief Patron as well." (All Manipur Theatre Conference, 1968)।

প্রথম দিকে বাংলা ভাষায় নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার পর মণিপুরিতে অনুবাদ করে নাটক মঞ্চস্থ হতে থাকে। ১৯২৫ সালে ইম্ফলে প্রথম মৌলিক মণিপুরি নাটক 'নরসিংহ' মঞ্চস্থ হয়। এতে উৎসাহিত হয়ে অধিকাংশ নাট্যকার মণিপুরের

পটভূমিকায় মণিপুরি ভাষায় নাটক লিখতে শুরু করেন। বিভিন্ন নাট্যসংস্থা গড়ে ওঠে, নাট্য আন্দোলনে প্রাণের সঞ্চার হয়। তখন গড়ে ওঠা উল্লেখযোগ্য নাট্য সংস্থা যা আজও জীবিত ও সক্রিয়, সেগুলো হলো- ১৯৩১ সালে গড়ে ওঠা অন্যতম প্রাচীন নাট্যসংস্থা মণিপুর ড্রামাটিক ইউনিয়ন, এরিয়ান থিয়েটার (১৯৩৫), চিত্রাঙ্গদা নাট্যমন্দির (১৯৩৬), সোসাইটি থিয়েটার (১৯৩৭), রূপমহল (১৯৪৩) ইত্যাদি।

সংস্কৃতিপ্রেমী মণিপুরিদের কাছে নবাগত এই কলাশৈলী অতি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তবে মণিপুরে নিজস্ব ঘরানার নাট্যচর্চা তার সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই শুরু হয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে তার গতিধারা অব্যাহত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মণিপুরে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচলিত হওয়ার আগে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে পালিত হতো 'লাই হারাওবা' উৎসব। এই সময় প্রতিদিন সন্ধ্যায় উৎসবস্থলে চলে নাচ-গান ও নাট্যধর্মী নানা অনুষ্ঠান। আর বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরের রাসলীলা, গোষ্ঠলীলা, গৌরলীলা, রামায়ণ ও মহাভারত ভিত্তিক নানা অনুষ্ঠানগুলোকে মণিপুরি নাটকের আদিরূপ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তাছাড়া, বাংলার যেমন নিজস্ব ঘরানার যাত্রাপালা রয়েছে তেমনি মণিপুরিদেরও রয়েছে 'শুমাংলীলা', উঠোনে মুক্ত মঞ্চে সে লীলা বা পালা অনুষ্ঠিত হয় বলে এর নামকরণ হয়েছে 'শুমাংলীলা'। আধুনিক নাটকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মণিপুরে শুমাংলীলার জনপ্রিয়তা আজও অটুট রয়েছে। শুমাংলীলায় এখনও পুরুষ অভিনেতারা মহিলা চরিত্রে দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করে থাকেন। যাই হোক, পঞ্চাশের দশকে এসে মণিপুরি নাট্য আন্দোলনে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। মণিপুরে নাট্য উৎসব ও নাট্যপ্রতিযোগিতা শুরু হয়। ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার আয়োজিত জাতীয় নাট্য উৎসবে যোগ দিয়ে সোরোখাইবম ললিত সিংহের পরিচালিত এম ডি ইউ-র নাটক 'হাওবং লৈশং শফবী' ফোক ক্যাটেগরিতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে। জাতীয় স্তরে মণিপুরি নাটকের স্বীকৃতি লাভে নাট্যকর্মীরা উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। তবে প্রকৃত অর্থে মণিপুরের নাট্য আন্দোলনের জয়যাত্রা শুরু হয় সত্তরের দশকে। নতুন আঙ্গিকে নাটকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে অরিবম শ্যাম শর্মা, এইচ কানহাইলাল, অরাম্বম লোকেন্দ্র, রতন থিয়াম, স্যানখ্যা ইবোতোম্বী প্রমুখ নাট্য পরিচালকেরা।

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছোট্ট এক প্রান্তিক রাজ্য থেকে উঠে এসে ভারতীয় নাট্য শিল্পকে বিশ্বের নাট্যমঞ্চে যিনি তুলে ধরেছেন তিনি হলেন ভারতের গর্ব মণিপুরের নাট্য পরিচালক রতন থিয়াম। গত ২৩ জুলাই ৭৭ বছর বয়সে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে চিত্রশিল্পী, লেখক, নাট্যকার, মিউজিসিয়ান, কোরিওগ্রাফার, ডিজাইনার ও নাট্য পরিচালক।

রতন থিয়ামের পিতা থিয়াম তরুণকুমার, মা বিলাসিনী দেবী ছিলেন প্রখ্যাত মণিপুরি নৃত্যশিল্পী ও নৃত্যগুরু। তাঁরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে মণিপুরি নৃত্য প্রদর্শন ও প্রচার করতেন। এক সময় তাঁরা চৈতন্যদেবের জন্মভূমি নবদ্বীপে স্থায়ী ঠিকানা গেড়ে সেখান থেকেই তাঁরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়াতেন। সে সময়েই ১৯৪৮ সালের ২০ জানুয়ারি নবদ্বীপে রতন থিয়ামের জন্ম এবং তাঁর কৈশোর জীবন কাটে সেখানেই। চৈতন্যস্মৃতি বিজড়িত নবদ্বীপধামে জন্ম বলেই বাবা-মা আদর করে তাঁকে নিমাই বলে ডাকতেন। শিশু নিমাইয়ের ঘুমপাড়ানি গান ছিল মণিপুরি নাচের গান আর তাঁর ঘুমও ভাঙতো সেই গানের সুরেই। নৃত্যশিল্পী বাবা-মা আদরের নিমাইকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন তাঁদের নৃত্যানুষ্ঠানে। নাচের কস্ট্যুম বাক্সই ছিল শিশু রতন থিয়ামের বিছানা। বলাবাহুল্য তিনি এক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বড় হয়েছেন। কৈশোরে তিনি হতে চেয়েছিলনে চিত্রশিল্পী। তাই তিনি ভর্তি হয়েছিলেন আঁকা শেখার স্কুলে। ইম্ফলে ডি এম কলেজে পড়ার সময় সাহিত্যানুরাগী বন্ধুদের সংস্পর্শে এসে মেতে উঠেন গল্প ও কবিতা লেখায়। তাঁর তরুণ বয়সের গল্প ও কবিতা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তখনই বেশ কয়েকটি কবিতা ও গল্পের বই প্রকাশিত হয়েছিল। সুশ্রী তরুণ কবি শিগগিরই বড়দের প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠেন। তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মণিপুরের ঐতিহ্যবাহী সাহিত্যপত্র ‘ঋতু’-র সহ-সম্পাদকের। থিয়েটারপ্রেমী বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে তিনি আবার জড়িয়ে পড়েন নাট্যচর্চায়। নাট্যচর্চার রীতি ভালোভাবে রপ্ত করার জন্য দিল্লিতে গিয়ে জাতীয় নাট্য বিদ্যালয়ে (এনএসডি) ভর্তি হওয়ার জন্য তিনি মনস্থির করেন। এর জন্য তিনি এক বছর নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করেন ভারতীয় ও পাশ্চাত্য নাট্যশাস্ত্র ও সাহিত্য নিয়ে। ফলে ১৯৭১ সালে তিনি অনায়াসে জাতীয় নাট্য বিদ্যালয়ে ভর্তি পেয়ে যান এবং অল্পদিনেই এনএসডি-র তৎকালীন ডিরেক্টর স্বনামধন্য নাট্যব্যক্তিত্ব ইব্রাহিম আলকাজির প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠেন। ১৯৭৪ সালে তিনি সসম্মানে নাট্যশাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর মণিপুরে ফিরে এসে নিবিড় নাট্যচর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি ইম্ফলে গড়ে তুলেন কোরাস রিপার্টরি।

রতন থিয়াম প্রথম দিকে মণিপুরি লোককাহিনিকে ভিত্তি করে নাট্য প্রযোজনা করে মণিপুরি থিয়েটারকে জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। সে সময়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রযোজনাগুলো হল- শন্দ্রেম্বী চাইশ্রা (১৯৭৭), উচেক লাইমৈদোং (১৯৭৮), লৈমা য়েংলিঙৈদা খুনু কাবা (১৯৮০) ইত্যাদি। দ্বিতীয় পর্যারে তিনি ভারতীয় মহাকাব্য ও ক্লাসিক নাটকগুলো তাঁর মতো করে উপস্থাপন করেন। এ

পর্যায়ের তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হল- মহাভাতের ত্রিলোজি-ভাসের ‘কর্ণাভরম’ (১৯৭৯), উরুভঙ্গম (১৯৮১) এবং থিয়ামের নিজের স্ক্রিপ্ট ‘চক্রব্যুহ’ (১৯৮৪), কালিদাসের ‘ঋতু সংহার’, অজ্ঞেয়-এর ‘উত্তর প্রিয়দর্শী’ (২০০০) ইত্যাদি। চক্রব্যূহ ও উত্তর প্রিয়দর্শী, এই দুটি নাটক তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতির চরম শিখরে পৌঁছে দেয়। মহাভারতের অভিমন্যুর কাহিনিকে ভিত্তি করে রতন থিয়াম নিজেই তৈরি করেন ‘চক্রব্যূহ’ নাটকের স্ক্রিপ্ট। যুদ্ধ ও নৈতিকতা এবং মানুষের নিয়তি নিয়ে গভীর প্রশ্ন তোলা হয় তাঁর এই নাটকে। নাটকের প্রথম দৃশ্যে অর্ধশায়িত অভিমন্যুর মাতৃজঠর রচনা করেছিল সাদা ধুতি ও গেঞ্জি পরা কোরাসের মণিপুরি নটসংকীর্তিনের ভঙ্গিমায়, পেছনে পাটাতনের ওপর অর্জুন-সুভদ্রার প্রণয়-কথন চলছিল। কথকতা, নটসংকীর্তন, মার্শাল আর্ট তার সঙ্গে ছিল যুদ্ধের দৃশ্যে শঙ্খ-মৃদঙ্গ-দামামা, ঢাল-তরোয়াল, তির-ধনুক, রঙিন ছত্র ও নিশান। সে এক অপূর্ব দৃশ্যকাব্য। পৃথিবীর প্রায় ৩০টি দেশের বিভিন্ন স্থানে শতাধিক বার মঞ্চস্থ হয়েছে এই নাটক। ১৯৮৭ সালে রতন থিয়ামের এই ‘চক্রব্যূহ’ নাটক ফ্রিঞ্জ ফার্স্ট ইন্টারন্যাশানাল এওয়ার্ড লাভের পর তাঁর খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি সে বছর সংগীত নাটক অকাদেমি পুরস্কারও পান। ভারতীয় নাট্য পরিচালকদের মধ্যে হাবিব তানবির তাঁর ‘চরণ দাস চোর’ নাটকের জন্য ১৯৮২ এই পুরস্কার পেয়েছিলেন।

‘উত্তর প্রিয়দর্শী’ নাটক সম্রাট অশোকের হিংসার বিরুদ্ধে শান্তির পক্ষে বিবেক জাগরণের কাহিনি। এই নাটকে রতন থিয়ামের মঞ্চ সজ্জা ও আলো আধারির খেলা এতটাই গভীর ও প্রতীক সমৃদ্ধ যে দর্শক মুগ্ধ ও চিন্তায় নিমগ্ন হয়। হাতিতে চড়ে মঞ্চের পটভূমি থেকে সৈন্য সামন্ত নিয়ে চন্ডাশোকের আবির্ভাবে বিস্মিত হতে হয়। কী কুশলতায় স্পেস ডিজাইন করলে অশোককে পিঠে নিয়ে হাতির অবয়ব, এক সারি ক্রূর যোদ্ধা ও তাদের হতে অস্ত্র, উঁচু পতাকা ব্যাকস্টেজে আঁটিয়েও সামনে অঢেল খোলা পরিসরের ভাব তৈরি করা সম্ভব। সামনে তখন একদল ভীত বৌদ্ধ ভিক্ষু।

২০০০ সালে ওয়াশিংটন ডি সি-র জন কেনেডি সেন্টার ফর পারফর্মিং আর্টস সহ আমেরিকার ৮টি শহরে উত্তর প্রিয়দর্শী মঞ্চস্থ করার নিমন্ত্রণ পেয়ে রতন থিয়াম তাঁর নাট্যদল নিয়ে প্রথমবার পাড়ি দেন আমেরিকায়। দেড় মাস ধরে আটটি শহরে উত্তর প্রিয়দর্শী মঞ্চস্থ করে আমেরিকাবাসীর মন জয় করেন। আমেরিকার পত্র-পত্রিকায় উত্তর প্রিয়দর্শী উচ্চ প্রশংসিত হয়। আমেরিকার প্রখ্যাত নাট্য সমালোচক Margo Jefferson রতন থিয়াম ও তাঁর নাটকের ভূয়সী প্রশংসা করে

The New York Times-এ লিখেন, "... I would call this composer writer-director-choreographer a genius, and I would call the experience of seeing 'Uttar Priyodorshi' transcendent.' মণিপুরের স্বনামধন্য নাট্যসমালোচক প্রয়াত ড. এন তোম্বী ইস্ফলের কোরাস রিপার্টরিতে দীর্ঘ ৮ ঘন্টা ধরে রতন থিয়ামের সফল আমেরিকা সফর প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের বিবরণী থেকে জানা যায়, জন কেনেডি সেন্টার ফর পারফর্মিং আর্টস-এ রতন থিয়ামের আগে নাকি কোনো ভারতীয় নাট্য পরিচালকের নাটক মঞ্চস্থ হয়নি। পৃথিবীর সব নাট্য পরিচালকেরই স্বপ্ন, আমেরিকার জন কেনেডি মঞ্চে জীবনে একবার নাটক মঞ্চস্থ করা। জন কেনেডি সেন্টারে তাঁর নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার এক বছর আগে থেকেই নাকি ব্যক্তি রতন ও তাঁর নাটক, নাট্যদল, মণিপুর, ভারতসহ সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়া শুরু করে দিয়েছিল। সেই প্রজেক্টের নাম নাকি দেওয়া হয়েছিল 'Backstage/Onstage Ratan Thiyam। দর্শকরা নাকি নাটক সম্পর্কে খুব সচেতন। নাটক শেষ হওয়ার পরও নাকি ২০/৩০ জন দর্শক গভীর রাত পর্যন্ত তাঁকে তাঁর নাটক সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করেছিল।

তাঁর নাটক আমেরিকার দর্শকদের অতি পছন্দ ও প্রশংসার কারণ জানতে চাইলে রতন থিয়াম বলেন, তিনি পশ্চিমাদের মতো বিজ্ঞান প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে চমকপদ সার্কাস দেখাবার চেষ্টা করেননি। তাঁর জন্মভূমি ছোট্ট রাজ্য মণিপুরের যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে তারই নান্দনিকতায় তিনি পশ্চিমা দর্শকের মন জয় করতে পেরেছেন।

তৃতীয় পর্যায়ে তিনি বিদেশি নামী লেখক যেমন সেক্সপিয়ারের 'ম্যাকবেথ', ইবসেনের 'হোয়েন উই অ্যাওয়েকেন' নাটকগুলো রতন থিয়াম তাঁর মতো করে উপস্থাপন করেছেন। ম্যাকবেথ চরিত্রটিকে তিনি একটি সামাজিক ব্যাধি হিসেবে দেখিয়েছেন।

শেষ পর্যায়ে রতন থিয়াম আবার মণিপুরের পটভূমিকায় মণিপুর ত্রিলোজি 'ওয়াহৌদোক' (Prologue), 'হে নুংশিবী পৃথিবী' (My Earth, My Love) এবং 'চীংলোন মাপন তম্পাক অমা'(Nine Hills One Valley) নিজে লিখে সফল ভাবে মঞ্চস্থ করেন। এর মধ্যে 'নাইন হিলস ওয়ান ভেলি' অতি সফল একটি নাটক। এটি মণিপুরের হিংসা, সন্ত্রাস, অশান্তির পটভূমিকায় রচিত একটি নাটক। নাটকটির প্রথম দৃশ্যেই গ্রামের বয়স্কা মায়েরা নিজের গ্রাম ও সন্তানেরা যাতে সুখে শান্তিতে থাকে তার জন্য মণিপুরি সমাজের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী গ্রামের তিন রাস্তার মোড়ে অপদেবতাদের তুষ্ট করার জন্য পর্যাপ্ত উপাচার দিয়ে পুজো দেয় এবং তাদের

এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য নিবেদন করে। গ্রামীণ মণিপুরিদের লোকবিশ্বাস এতে করে গ্রামবাসী ও সন্তানরা অপদেবতার কুনজর থেকে রক্ষা পায়। মায়েরা অপদেবতাদের পুজো দিয়ে ঘরে ফিরে আসতে না আসতেই তাদের যুবক ছেলেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উচ্চস্বরে মাকে ডাকতে ডাকতে ছুতে আসে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস অথবা নিজেদের গোষ্ঠী কোন্দলে মণিপুরের যুবক ছেলেদের জীবন বিপন্ন। মায়েরা ভীত সন্ত্রস্ত সন্তানদের কোলে টেনে নিয়ে রক্ষা করতে চায়। অসাধারণ! মণিপুরের ঘটমান বাস্তব দৃশ্য দিয়ে শুরু এই নাটক। ২০০৫ সালে এনএসডি আয়োজিত দিল্লিতে ৮ম ভারত রঙ উৎসবে রতন থিয়ামের এই নাটক মঞ্চস্থ হয়। উৎসবে এই নাটক উচ্চ প্রশংসিত হয়। অভিনয়ের শেষে রতন থিয়ামকে সংবর্ধিত করার জন্য মঞ্চে ওঠে এনএসডি-র প্রাক্তন ডিরেক্টর আলকাজি প্রিয় শিষ্যকে বুকে টেনে নিয়ে বলেন, ‘What greater joy can there be for a teacher than to see his student surpass him, in this evening’s performance, Ratan has achieved more than what I have in my entire bodz of work.’ গুরুর কাছ থেকে পাওয়া এই শংসা বাক্য শিষ্য রতন থিয়ামের জীবনে পরম পাওয়া। এরপর তিনি যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যপরিচালক বলতে তেমন আর দ্বিধা থাকার কথা নয়।

রতন থিয়ামের সর্বশেষ নাটক ‘ধরমবীর’ ভারতীয় আখ্যানধর্মী কবিতা ‘কানুপ্রিয়া’কে নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চস্থ করেছেন। এর প্রিমিয়ার শো প্রদর্শিত হয়েছে ২০২৪ সালের ৩০ মার্চ গোয়ালিয়রে। এরপর এপ্রিলে মঞ্চস্থ হয়েছে দিল্লিতে। মণিপুরসহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের হিংসা সন্ত্রাসের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে এই নাটকে। এ অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনা হবে বলে কথা দিয়েও তা রাখতে না পারায় কানুপ্রিয়া কানুর প্রতি ক্ষোভ ও অভিমান প্রকাশ করেছেন। নাটকের শেষ দৃশ্যে শোকাতুর কানুপ্রিয়া সাদা পোশাক পরে শবযাত্রায় পা মিলিয়েছেন।

তাঁর রাজ্য মণিপুরে ঘটে চলা অবিরাম হিংসা, সন্ত্রাস, অশান্তিতে রতন থিয়াম বীতশ্রদ্ধ। তাই তাঁর প্রায় প্রতিটি নাটকে তিনি যুদ্ধ, হিংসা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ও শান্তির পক্ষে বার্তা দিয়েছেন। হিংসার বিরুদ্ধে ও শান্তির পক্ষে রতন থিয়ামের পদচারণা নাট্যমঞ্চেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভারত সরকার এবং এনএসসিএন-এর চুক্তির ফলে মণিপুরের অখন্ডতা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় ২০০১ সালের ১৮ জুন মণিপুরের অগণিত জনতা ইম্ফলে রাজপথে নেমে প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন। সেদিন আন্দলনরত নিরস্ত্র জনতার উপর নিরাপত্তা বাহিনী নির্বিচারে গুলি চালায়। এ ঘটনায় ১৮ জন প্রতিবাদী মানুষ শহিদ হন। নিরস্ত্র মানুষের উপর এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদে সেদিন রতন থিয়াম ভারত সরকারের দেওয়া ‘পদ্মশ্রী’ উপাধি

ফিরিয়ে দেন। ১৮ জন শহিদের স্মরণে তাঁদের সমাধিস্থলে অনুষ্ঠিত কবিতা পাঠে তিনিও মণিপুরের বিশিষ্ট কবিদের সঙ্গে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। তাঁর সেই বিখ্যাত কবিতার শেষ পঙক্তি আজ মণিপুরের মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত-'চৎখ্রেদো নখোয়দি শিংবা ঙম্লরোইদবা লমন তোনশিল্লম্লগা/নখোয়দি তুমখ্রে ঐখোয়বু হৌদোকপিরম্লগা।' (আমাদের ঋণী করে চলে গেছ / ঘুমিয়ে পরেছ তোমরা, আমাদের জাগিয়ে দিয়ে)। মণিপুরবাসীর শোক-দুঃখের কথা উপেক্ষিত রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। সেই প্রেক্ষাপটে লেখা কবিতাসমূহ সংকলিত করে রতন থিয়াম ২০১৮ সালে প্রকাশ করেন তাঁর ৬ষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'তাব্দ্রিবা তেংথাখোল' (উপেক্ষিত কান্নার রোল)। তিনি নাট্যচর্চার ব্যস্ততার মধ্যেও ৭টি কাব্গ্রন্থ, ৪টি উপন্যাস, ১টি গল্পগ্রন্থ লিখে গেছেন। এছাড়াও লিখেছেন ১০টি মৌলিক নাটক ও ১টি একাঙ্ক। অনুবাদ ও নাট্যরূপ দিয়েছেন গ্রিস ও ভারতীয় ক্লাসিক নাটক, শেক্সপিয়ারের 'ম্যাকবেথ', ইবসেনের 'হোয়েন উই ডেড অ্যাওয়েকেন, রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' ও 'বিদায় অভিশাপ' (নাট্যরূপ), ধরমবীর ভারতীর একাধিক কবিতার মণিপুরি নাট্যরূপ ইত্যাদি। নাট্য নির্দেশনা করেছেন ৫০টির বেশি ।

তাঁর Manipur Trilogy (Prologue, My Earth, My love Ges Nine Hills, One Valley) মণিপুরি নাটক ইংরেজি অনুবাদ করেছেন তায়েঞ্জম বিজয়কুমার, সম্পাদনা রূপাঞ্জলি বরুয়া এবং প্রকাশ করেছে Wordsmith Publisher, Guwahati (২০০৮)। কবিতা নাগপাল রতন থিয়ামের বিখ্যাত নাটক 'চক্রব্যূহ'-এর আলোচনাসহ মূল নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেছেন এবং তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে সিগাল বুক্স, কলিকাতা (১৯৯৮)।

রতন থিয়াম ও তাঁর কোরাস রিপার্টরি নিয়ত সৃষ্টিশীল কাজে রত ছিলেন। বিশ্ব ভ্রমণ করে তিনি তাঁর থিয়েটারের মাধ্যমে শান্তির বাণী প্রচার করছিলেন। দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগ মাঝপথে তাঁর জীবন কেড়ে নিয়ে গেল। অথচ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আজ বেজে উঠছে যুদ্ধের দামামা। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড় করিয়েছে। বিশ্বের এই সংকটময় মুহূর্তে রতন থিয়ামের মতো শান্তির পূজারিদের খুব দরকার ছিল। মহান এই নাট্য পরিচালকের অকাল প্রয়াণে ভারত তথা পৃথিবীর নাট্য আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হলো।

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মণিপুরের দুই নাট্য ব্যক্তিত্ব এইচ কানহাইলাল ও রতন থিয়াম মণিপুরি থিয়েটারকে বিশ্ব নাট্যমঞ্চে তুলে ধরেছিলেন। তাঁরা মণিপুরে নাট্যচর্চাকে যে উচ্চ মাত্রায় পৌঁছে দিয়ে গেছেন তাঁদের অনুপস্থিতিতে তা কি ধরে

রাখতে পারবেন নতুন প্রজন্মের নাট্যপরিচালকরা! নাট্যপ্রেমীদের মনে এই সব প্রশ্ন জাগাটাই স্বাভাবিক। এটা ঠিক, কানহাইলাল ও রতন থিয়ামের খালি আসন খুব সহজে পূরণ হবার নয়। তাই বলে তাঁদের অনুপস্থিতিতে মণিপুরের নাট্যচর্চা একেবারেই থমকে যাবে বলে হতাশ হওয়ারও কারণ নেই। কলাক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠাতা পদ্মভূষণ কানহাইলাল প্রয়াত হয়েছেন আজ থেকে ন'বছর আগ ২০১৬ সালের ৬ অক্টোবর। কলাক্ষেত্রের নাট্য পরিচালানার দায়িত্ব নিয়েছেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র হেইস্নাম তোম্বা। তাঁকে নানাভাবে পরামর্শ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন মা পদ্মশ্রী সাবিত্রী দেবী। পিতা কানহাইলালের বিখ্যাত নাটকগুলো পুনর্মঞ্চায়নের পাশাপাশি ইতিমধ্যেই তাঁর নির্দেশনায় বেশ কয়েকটি সফল নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হলো- মিরালম্বা-১, শম্নদ্রবা মমি, ক্ষুধিত পাষাণ (রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প অবলম্বনে), ইমা নঙগী নতম্বাক্তা, পিথাদোই, মিরালম্বা-২ ইত্যাদি। তাছাড়া ইম্ফলে ও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে তিনি নাট্যকর্মশালা পরিচালনা করেছেন। গত বছর (অক্টোবর, ২০২৪) কেরালার কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ড্রামা এন্ড ফাইন আর্টস-এর ব্যবস্থাপনায় এক মাস ব্যাপী নাট্যকর্মশালায় কানহাইলালের বিখ্যাত নাটক 'কবুই কেইওইবা' (Tigerman) অংশগ্রহণকারী নাট্যকুশলীদের তিনি প্রশিক্ষণ দিয়ে মালায়ালম ভাষায় মঞ্চস্থ করিয়েছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত ও বিদেশ থেকে নাট্যকর্মীরা কানহাইলালের নাট্যশৈলী শেখার জন্য কলাক্ষেত্রে নিয়মিত আসেন। এ প্রসঙ্গে কলাক্ষেত্রের বর্তমান পরিচালক হেইস্নাম তোম্বার সঙ্গে নিবন্ধকারের ফোনালাপে তিনি জানিয়েছেন এখন (১০/১০/২০২৫ থেকে) কলাক্ষেত্রে ১৫ দিন ব্যাপী জাতীয় নাট্যকর্মশালা চলছে। অন্ধ্র, কেরালা, কর্ণাটকা, মুম্বাই, দিল্লি, ওড়িশা, আসাম ইত্যাদি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নাট্যকর্মীরা এই নাট্যকর্মশালায় অংশ নিয়েছেন। ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় 'পিথাদোই' নাটক প্রযোজিত হয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন টাটা ফাউন্ডেশনের সঙ্গে কলাক্ষেত্রের আলোচনা চলছে। তাদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে কলাক্ষেত্রে নাট্য প্রশিক্ষণের ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। পিতার জীবিতকালেই তাঁর নির্দেশনায় দু-তিনটে নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে।

প্রয়াত রতন থিয়ামের সুযোগ্য পুত্র থওয়ায় থিয়ামও কোরাস রিপার্টারি'র হাল ধরেছেন। বেশ কয়েকটি নাটক প্রযোজনায় তিনি পিতার সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন। পিতার জীবিতকালেই তার নির্দেশনায় দু-তিনটে নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। আশা রাখি তিনিও কলাক্ষেত্রের হেইস্নাম তোম্বার মতো পিতার হাতে গড়া কোরাস রিপার্টারিকে সুনামের সঙ্গে বাঁচিয়ে রাখবেন।

তাছাড়া লৌরেম্বম কিশোরজিৎ, সংগীত নাটক অকাদেমি যুব পুরস্কার প্রাপ্ত ড. এস থানিনমলৈমা, তোইজম শিলা দেবী, নাট্যকার ও নাট্যসমালোচক বুধ চিংখাম, মাইম থিয়েটারে সংগীত নাটক অকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত য়ুম্নাম সদানন্দ, ভিক্টর থৌদাম, এস আশিস, মহম্মদ জুমা খা প্রমুখ নতুন প্রজন্মের নাট্য নির্দেশকরা নিজ নিজ শৈলীতে নাট্য প্রযোজনা করে মণিপুরের নাট্য আন্দোলনের ধারাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের মধ্য থেকেই একদিন হয়তো উঠে আসবে কানহাইলাল ও রতন থিয়ামের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নাট্যনির্দেশক।

তথ্যসূত্র:

১. মণিপুরী থিয়েটারগী ওয়ারোল- প্রো. নোংমাইলেথম তোম্বী সিংহ (নোংমাই পণ্ডিত)।
২. Manipur Trilogy-Ratan Thiyam Translator : Tayenjam Brojokumar Singh.
৩. মালেম্না শকখঙনরবা শকনায়রবা থিয়েতর দিরেক্তর রতন থিয়াম-লমাগো, পোক্নফম।

আদিবাসীদের রক্ত ডাকাতি

পাভেল পার্থ

আদিবাসী জনগণের ক্ষেত্রে একটি কথা প্রায়ই উচ্চারিত হয়, ‘সব লুট হয়ে যাচ্ছে’। জল থেকে জঙ্গল, মগজ থেকে ময়দান। কেবল বাংলাদেশ নয়, দুনিয়াজুড়েই আদিবাসী অঞ্চল লুটতরাজের এক প্রশ্নহীন নিশানা। বাংলাদেশে আদিবাসীদের বসতি লুট হয়েছে, জমি লুট হয়েছে, লোকায়ত জ্ঞান লুট হয়েছে, বীজ ও প্রাণসম্পদ লুট হয়েছে, জঙ্গল লুট হয়েছে, স্বপ্ন লুট হয়েছে। লুট হচ্ছে অস্তিত্ব ও আত্মপরিচয়। এ নিয়ে তর্ক তালাশও আছে। কিন্তু যদি বলা হয়, আদিবাসীদের রক্তও লুট হয়ে যাচ্ছে। কর্পোরেট জেনেটিক গবেষণার নামে আদিবাসীদের রক্ত ডাকাতি করে নেয়া হচ্ছে। হয়তো অনেকের কাছে এই বিবৃতি বিস্ময় আর ধাক্কা লাগার মতনই। কিন্তু হচ্ছে, এই প্রবল রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ভেতরেই গবেষণার নামে বাংলাদেশের আদিবাসী জনগণেরও রক্তও নানাভাবে নানাগবেষণায় আদিবাসীদের পূর্ণ সম্মতি ছাড়া প্রশ্নহীনভাবে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। কেউ এ বিষয়ে কোনো তর্ক তুলেনি, কারণ ঘটনা গুলো ঘটছে একান্ত বিদ্যায়তনিক পরিসরে। যার কোনো পাবলিক প্রামাণ্য দলিল হাতের নাগালে থাকছে না। চলতি আলাপখানি বাংলাদেশের আদিবাসীদের রক্ত-নমুনা নিয়ে করা বেশকিছু জেনেটিক গবেষণার তথ্য তুলে ধরেছে।

আদিবাসী জনগণের পূর্ণ সম্মতি ও অংশগ্রহণ ছাড়া রক্ত নিয়ে করা এসব জেনেটিক গবেষণার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের নীতি কী হবে এবং বাংলাদেশের আদিবাসী সমাজ নিজেদের রক্ত নিয়ে করা জেনেটিক গবেষণাকে কীভাবে আন্দাজ করবেন এসব খুব জরুরি সিদ্ধান্ত। বাংলাদেশের আদিবাসীদের রক্ত নিয়ে জেনেটিক গবেষণা, ডিএনএ গবেষণার নৈতিকতা, কর্পোরেট প্রাণডাকাতি এবং গবেষণার নামে আদিবাসীদের রক্ত নিয়ে যে বাণিজ্যিক বাহাদুরি চলছে চলতি আলাপ তার কিছুটা তুলে ধরবার চেষ্টা করেছে। এ বিষয়ে বাংলায় এটি একেবারেই একটা প্রাথমিক ধাপের আলাপ। চলতি আলাপ চায় আদিবাসীদের রক্ত নিয়ে করা গবেষণা প্রতিবেদনগুলো আদিবাসী সমাজের সাথে বিনিময় করা হোক। এসব

গবেষণা প্রকল্প থেকে গবেষকরা যে ধরণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক লাভ অর্জন করেছেন তা আদিবাসী সমাজের সাথে বিনিময় করা হোক। গবেষণার নামে আদিবাসীদের কাছ থেকে সংগৃহীত রক্তনমুনাগুলো এবং এর সকল জেনেটিক তথ্য কোথাও বানিজ্যিকভাবে বন্দী আছে কীনা বা কোনো ধরনের পেটেন্ট হয়েছে কীনা আমরা জানি না। চলতি আলাপ প্রাণ ও তথ্যের উপর সকল ধরণের বাণিজ্যিক পেটেন্টের বিরোধীতা করে। প্রতিটি সমাজেই রক্ত এক মৌলিক পবিত্র জীবন্ত সত্তা। গবেষণার নামে রক্তের নানাবিধ সম্মতিহীন বানিজ্যিক ব্যবহার, আদিবাসী জাতিসমূহের ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের উপর এক প্রবল আঘাত। চলতি লেখাটি এই আঘাতকে প্রশ্ন করেই আদিবাসী রক্ত ও জেনেটিক গবেষণার নীতি বিষয়ে একটা প্রাথমিক আলাপ তুলছে।

প্রাণডাকাতি ও প্রাণউপনিবেশীকরণ

আদিবাসী জাতিসমূহের শরীর ও প্রাণসম্পদ নিয়ে গবেষণার নানা তর্ক এবং প্রাণডাকাতি বিষয়ে বাংলাদেশে খুব একটা বাহাস দেখা যায় না। পার্থ (২০০৮) তার একটি লেখায় এ বিষয়ে জানান, পৃথিবীতে আদিবাসীরাই সম্ভবত সর্বাধিক গবেষিত জনগোষ্ঠী। চলতি সময়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, 'বায়োপ্রসপেক্টিং' এবং জীনপ্রযুক্তি গবেষণার নামে আদিবাসীদের ব্যবহৃত প্রাণসম্পদ এবং প্রাণসম্পদনির্ভর ঐতিহ্যগত জ্ঞান ব্যবস্থা ছিনতাই ও চুরি হয়ে যাচ্ছে।[১] ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও প্রাণসম্পদের উপর আদিবাসীদের অধিকার বিপন্ন হচ্ছে এবং প্রাণসম্পদের নিত্যনতুন ভিন্ন ব্যবহার ও একক বাণিজ্যিক দখল তৈরী হচ্ছে। উপনিবেশিক দখল একটা সময় শুরু হয়েছিল ভূমি ও দেশ দখল নিয়ে , চলতি সময় যার ক্ষেত্র হয়েছে প্রাণসম্পদ ও লোকায়ত জ্ঞান ব্যবস্থা। প্রাণসম্পদ ও লোকায়ত জ্ঞান প্রক্রিয়া

[১] দেখুন: পাভেল পার্থ, আন্তর্জাতিক প্রাণবৈচিত্র্য সনদ (১৯৯২) ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট: আন্তজার্তিক প্রাণবৈচিত্র্য সনদের বাস্তবতায় বাংলাদেশের আদিবাসী জনগণের প্রাণবৈচিত্র্য ও প্রাণসম্পদের অধিকার, তৃণমূল ও বারসিক আয়োজিত তিনদিন ব্যাপি 'আন্তজার্তিক প্রাণবৈচিত্র্য সনদ: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট' শীর্ষক কর্মশালার মূল প্রবন্ধ হিসেবে পঠিত। ২৩-২৫ নভেম্বর ২০০৮। ওয়াই ডব্লিউ সি এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। লেখাটি পরবর্তীতে দীপায়ন খীসা সম্পাদিত মাওরুম শীর্ষক ছোট কাগজ এবং রাঙামাটির জুম ঈসথেটিক কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত জাক-এর প্রকাশনায় প্রকাশিত হয়েছে।

[২] Herry, Debra. 2001, Biopiracy and globalization : Indigenous peoples face a new wave of colonialism, source : http://icpb.org/publication/other_art/globalization.html

ছিনতাইকারী প্রাণডাকাতরাই আজ নিজেদেরকে প্রচার করছেন 'আবিষ্কারক' হিসেবে এবং এরাই আজ তথাকথিত 'বায়োপ্রসপেক্টিং' এর মাধ্যমে লোকায়ত জ্ঞান ও প্রাণসম্পদের বৈধ মালিক বনে যাচ্ছেন। ধীরে ধীরে প্রাণসম্পদ ও লোকায়ত জ্ঞান প্রক্রিয়ার উপর আর জনগণের সার্বজনীন মালিকানা ও কর্তৃত্ব বাতিল হয়ে যাচ্ছে। প্রাণসম্পদ হয়ে যাচ্ছে বহিরাগত বাণিজ্য দস্যুদের একক বানিজ্যিক সম্পত্তি এবং তারা কেবল এইগুলোকে বাজারের 'পণ্যে' পরিণত করছে। প্রাণসম্পদ থেকে জ্ঞান, কারিগরি থেকে শরীর ঘিরে এইসব একতরফা কর্পোরেট ছিনতাই ও ডাকাতিকে হ্যারি (২০০১) তাঁর একটি লেখায় 'প্রাণউপনিবেশীকরণ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো জানান, এই প্রাণউপনিবেশীকরণের প্রধান টার্গেট আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং তাদের ব্যবহৃত প্রাণসম্পদ। আদিবাসীদের প্রাণসম্পদ ও ডিএনএ (ডিঅক্সি-রাইবো-নিউক্লিক এসিড) আদিবাসীদের কোনো সিদ্ধান্ত ও মতামত ছাড়া দখল হচ্ছে এবং পেটেন্টকৃত নতুন বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত হচ্ছে।[২] পার্থ (২০১৫) মনে করেন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নিয়ন্ত্রিত কর্পোরেট বিশ্বায়নের এই দুনিয়ায় ক্ষমতাহীন নিম্নবর্গ মানুষের চারধারের প্রাণসম্পদ, সম্ভাবনা, জ্ঞান, মেধা, শরীর সবই একতরফা দখল ও মালিকানাধান করার বৈধতা তৈরি করেছে বহুজাতিক কোম্পানিরা। গবেষণা ও উন্নয়নের নামে জনগণের মেধা ও বুদ্ধিজাতসম্পদের একতরফা ছিনতাই ও ডাকাতি হচ্ছে। এক্ষেত্রে লোকায়ত জ্ঞান ও প্রাণসম্পদ হচ্ছে কর্পোরেট বাণিজ্যের অব্যর্থ নিশানা। জনগণের লোকায়ত ঔষধি জ্ঞান ও প্রাকৃতিক উৎসের উপরেই দাঁড়িয়েছে কর্পোরেট ঔষধ বাণিজ্য। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ২৩টি অসম চুক্তির একটি হচ্ছে "*বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধাস্বত্ব চুক্তি (Agreement on trade related aspects of Intellectual Property rights/TRIPS)*। ট্রিপস চুক্তির ২৭.৩ (খ) অনুচ্ছেদে প্রাণসম্পদ, জ্ঞান, প্রযুক্তির উপর পেটেন্টের অধিকারের রাখা হয়েছে।[৩] আলাপের এ পর্যায়ে আমরা দুনিয়া কাঁপানো কিছু কর্পোরেট ছিনতাই ও ডাকাতির কথা তুলবো। আদিবাসী অঞ্চল থেকে এইসব প্রাণসম্পদ গুলো ডাকাতি করেছে দুনিয়ার দশাসইসব কর্পোরেট কোম্পানিরা। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন বনের গুয়াজাজারা আদিবাসীরা Pilocarpus

[৩] দেখুন: পাভেল পার্থ, মেধাস্বত্ত্ব, বাণিজ্য ও রাজনীতি, দৈনিক বণিকবার্তা, ২৬ এপ্রিল ২০১৫, ঢাকা

[4] Posey, Dr. Darrell Addison. 1998, Biodiversity, genetic resources and indigenous peoples in Amazonia : (re) discovering the wealth of traditional resources of native amazonians, Institute of Latin American Studies, University of London, p 4-11

jaborandi নামের একটি উদ্ভিদ ঐতিহ্যগতভাবে ব্যবহার করতেন। জন উদ্ভিদবিদদের মাধ্যমে নতুনভাবে ‘আবিষ্কৃত’ এই উদ্ভিদ বর্তমানে আমাজন বনের আদিবাসীদের কাছ থেকে এর অধিকার বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। চোখের গ্লুকোমা রোগের চিকিৎসায় ব্রাজিল একাই প্রতি বছর প্রায় আড়াই কোটি টাকার এই গাছ বিক্রি করে।[৪] আর সমস্যাটি এখানেই, এই গাছ প্রাকৃতিক বন থেকে বাণিজ্যিকভাবে আহরণের ফলে বনের বাস্তুসংস্থান যেমন পাল্টে যাচ্ছে এবং গুয়াজাজারা আদিবাসীরাও এই গাছের উপর তাদের ঐহিত্যগত অধিকার হারিয়ে ফেলছেন। জুমা ও ওজওয়াং (১৯৯৬) জানিয়েছেন, আমেরিকায় ব্যবহৃত ও বিক্রিত ঔষধের অনেক কিছুই উদ্ভিদজাত এবং যা প্রায় ৪০ প্রজাতির উদ্ভিদ থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং এর ভেতর প্রায় ৫০ ভাগ সংগ্রহ করা হয় বর্ষারণ্য থেকে। এইসব উদ্ভিদের প্রায় ২০টি থেকে আমেরিকার অর্থনীতি আয় করে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা।[৫] এইসব উদ্ভিদের অধিকাংশের ব্যবহারই আদিবাসী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীদের লোকায়ত ঐতিহ্যগত ব্যবহার থেকে সংগ্রহ করা হয়। ১৯৭০ সালে আমেরিকার জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউট (National Cancer Institute/NCI) কেনিয়ার সিম্বা পাহাড় থেকে *Maytenus buchananii* উদ্ভিদটি সংগ্রহ করে। এই উদ্ভিদটি ক্যান্সারের চিকিৎসায় সিম্বা পাহাড়ের দিগু আদিবাসীরা বংশপরম্পরায় ঐতিহ্যগতভাবে ব্যবহার করেন। NCI সিম্বা পাহাড় থেকে প্রায় ২৭.২ টন উদ্ভিদ সংগ্রহ করেন। পরবর্তীতে NCI এই উদ্ভিটিকে ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করার কার্যক্রম শুরু করেন। দিগু আদিবাসীদের কোনো পূর্বানুমতি ও স্বীকৃতি ছাড়া এই উদ্ভিদ সংগ্রহ এবং এর ব্যবহার শুরু হয়।[৬]

আমেরিকায় ১৯৯৫ সনে ভেষজ ঔষধ ও উদ্ভিদজাত সামগ্রী প্রায় ৫৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রি হয়, যার অধিকাংশই আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত প্রাণসম্পদ ও লোকায়ত জ্ঞান থেকে ডাকাতি করা। কিন্তু মোট বিক্রি বা লাভের কোনো অংশই আদিবাসীদের সাথে বিনিময় করা হয়নি, আদিবাসীরা কেবলমাত্র এর জন্য সংগ্রহকারী এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছেন। শামান ফার্মাসিউটিক্যালস (Shaman pharmaceuticals) এবং বডিশপ (Body Shop)

---

[5] Juma, C. and Ojwang, J.B. 1996, In land we trust: environment, private property and constitutional change, ACTS Press, Nairobi, p282-283

[6] Juma, C. 1989, The gene hunters : biotecnology and the scramble for seeds, Zed books and Princeton University press, London and Princeton

আমাজন বর্ষারণ্যের আদিবাসীদের সাথে কাজ করে তাদের ঐতিহ্যগত উদ্ভিদ ব্যবহার থেকে কিছু ব্যবহারকে বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে বিক্রি করা শুরু করে। জনউদ্ভিদ গবেষণার মাধ্যমে ব্রাজিলের কায়াপো বর্ষারণ্যের কায়াপো ইন্ডিয়ান আদিবাসীদের ব্যবহৃত উদ্ভিদ থেকে বডিশপ নামের একটি কোম্পানি শরীর সুরক্ষার জন্য কিছু বানিজ্যিক পণ্য তৈরী করে।[৭] ১৯৯১ সনে বডিশপ কমপক্ষে ৩০০ পণ্য তৈরী করে এবং এর বার্ষিক বিক্রির পরিমাণ দাঁড়ায় ৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৯৫ সনে বডিশপের মোট বার্ষিক বিক্রি দাঁড়ায় ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।[৮] কেবল ভূমি, জলধারা, জ্ঞান বা কারিগরি নয়, আজ কর্পোরেট কোম্পানিরা আদিবাসীদের রক্ত ও জেনেটিক বৈশিষ্ট্যও ডাকাতির নিশানা করেছে। এজন্য নির্দয়ভাবে ব্যবহৃত নানা নামের 'স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও ঔষধ গবেষণা প্রকল্প'। আর এসব কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে নানা বিদ্যায়তনিক ডিসকোর্স। শিক্ষক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও গবেষকেরাই আদিবাসী এলাকায় গিয়ে তাদের কাছে ডাকাতির তথ্য গোপন রেখে নানাভাবে আদিবাসীদের রক্ত সংগ্রহ করছেন এবং এসব নিয়ে সম্মতিহীন নানা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এর সকল তথ্য কোনোভাবেই পাবলিক পরিসরে উচ্চারিত হচ্ছে না। কিছু পাওয়া যাচ্ছে গবেষকদের প্রকাশিত কোনো গবেষণা প্রবন্ধে আর যখন আদিবাসীরা তাদের রক্ত-ডাকাতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন তখন। কারণ প্রতিটি ঘটনায় আদিবাসীরা দেশ ও দুনিয়ার কল্যাণে এবং নিজেদের স্বাস্থ্যগত পরীক্ষার জন্যই নিজেদের রক্তনমুনা গবেষকদের দিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এইসব রক্তনমুনা কোথায় কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার কিছুই আদিবাসীরা আর জানতে পারছেন না।

আদিবাসী রক্ত ও বায়োমেডিক্যাল গবেষণা

আদিবাসী রক্ত নিয়ে জেনেটিক বায়োমেডিক্যাল গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষকরা দেখানোর চেষ্টা করেন ভিন্ন ভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠী একই জেনেটিক বৈশিষ্ট্যে ধারণ করে কীনা, সেখান থেকে গবেষকেরা প্রমাণের চেষ্টা করেন তারা হয়তো

---

7 Larid. 1994, Natural products and the commercialization of traditional knowledge, In: Intellectual property rights for indigenous peoples : a sourcebook, edited by T. Greaves, Society for Applied Anthropoly, Oklahoma city, p145-149

8 Mugabe, Dr. John.Intellectual property protection and traditional knowledge, African center for technology studies, Nairobi, Kenya

একই আদি বংশ হতে উদ্ভূত। আদিবাসীদের স্থানান্তর, বিচরণ, নানাবিধ সম্পর্ক এবং ভাষিকবৈচিত্র্য এরকম নানাকিছুর ক্ষেত্রে জেনেটিক সম্পর্ক এবং ভৌগলিক ভিন্নতাকে বিশ্লেষণের একটা চল আছে। এসব জেনেটিক গবেষণার ফলাফলকে জানান দিয়ে নানাসময়ে নানা কর্তৃপক্ষ আদিবাসীদের নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। বিশেষ করে আদিবাসী আত্মপরিচয় ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ন্যায্যতাকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য এইসব জেনেটিক গবেষণা ব্যবহার করা হয়। যদিও এইসব জেনেটিক গবেষণার অন্যতম গোপন উদ্দেশ্য অধিকাংশ সময়ই সামনে আনা হয় না। রক্ত নিয়ে করা গবেষণা গুলোর ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় জাতিগত সম্পর্ক, মিল-অমিল, স্থানান্তর, বিবর্তন যাই প্রচার করা হোক না কেন এইসব জেনেটিক গবেষণার গোপন উদ্দেশ্য হলো আদিবাসী রক্তসমূহের ভেতর কোনো বিশেষ জিনগত বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা। যার মাধ্যমে পরবর্তীতে কোনো মেডিক্যাল গবেষণা বাণিজ্যকে চাঙ্গা করা যায়। লিউকেমিয়া বা রক্তশূণ্যতা এক জটিল স্বাস্থ্যগত সমস্যা। অনেকসময় ভাইরাসের কারণে এটি আরো জটিল রোগ হয়ে দাঁড়ায়। দ্বীপ রাষ্ট্র পাপুয়া নিউগিনির বর্ষারণ্যে বাস করে হগাহাই আদিবাসী জনগোষ্ঠী। মার্কিন বিজ্ঞানীদের একটি দল পরীক্ষা করে হগাহাই আদিবাসীদের রক্তে টি-সেল লিউকেমিয়া ভাইরাসের অস্তিত্ব পান। পরবর্তীতে মার্কিন 'জাতীয় স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান' ১৯৯৬ সনে হগাহাই আদিবাসীদের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যর রক্তকে পেটেন্ট করে। 'পাপুয়া নিউগিনি মানব টি-লিম্ফোট্রপিক ভাইরাস' নামে হগাহোই আদিবাসীদের এই জেনেটিক বৈশিষ্ট্য মার্কিন পেটেন্ট পায়। যার পেটেন্ট নাম্বার-৫,৩৯৭,৬৯৬।[৯] এই পেটেন্ট বাতিলের দাবিতে বৈশ্বিক তর্ক ওঠে এবং প্রতিবাদ হয়।

কানাডার ভ্যানকুবার দ্বীপের আরেক আমেরিইন্ডিয়ান আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নাম ন্যু-চাহ-নুল্থ (নুটকা)। এই জনগোষ্ঠীর ভেতর রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস বা বাত জাতীয় রোগের জটিলতা দেখা যায়। ১৯৮০ এর দশকে ব্রিটিশ কলাম্বিয়া

---

[9] Riordan, Teresa, 1995, Patents; A recent patent on a Papua New Guinea tribe's cell line prompts outrage and charges of 'biopiracy.' The New York Times| এ বিষয়ে আরো দেখা যেতে পারেঃ ETC group, US Government Dumps the Hagahai Patent : Official Notice to Coincide with Human Rights Day, click :
http://www.etcgroup.org/content/us-government-dumps-hagahai-patent; The National Institutes of Health: and the Papua New Guinea Cell Line, June 2006, by Bhat Amar, Cultural Survival Quarterly Magazine, click:
https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/national-institutes-health-and-papua-new-guinea-cell-line

বিশ্ববিদ্যালয় নুটকা আদিবাসীদের ভেতর রিউমাটয়েড আথ্রাইটিস নিয়ে একটি গবেষণা প্রকল্প শুরু করে। এটি নেতৃত্ব দেন জিনবিশেষজ্ঞ রিক ওয়ার্ড। ১৯৮৬ সনে রিক ওয়ার্ড কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চাকরি ছেড়ে দেন এবং নুটকা আদিবাসীদের কাছ থেকে সংগৃহীত রক্তনমুনা গুলো চুরি করে নিজের কাছে গোপনে রেখে দেন। পরবর্তীতে এই রক্তনমুনা নিয়ে তিনি উতাহ বিশ্ববিদ্যালয় ও ১৯৮৬ সনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে গবেষণা শুরু করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি 'ইন্সটিটিউট অব বায়োলজিক্যাল অ্যানথ্রোপলজি' এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ওয়ার্ড নুটকা আদিবাসীদের কাছ থেকে চুরি করে আনা রক্তনমুনাকে আদিবাসীদের না জানিয়ে আরো বহু গবেষণায় ব্যবহার করেন এবং আরো নানা প্রকল্পে প্রশ্নহীনভাবে ব্যবহার করেন। এই প্রকল্প থেকে প্রায় ৬টি গবেষণা প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে শিরাতে নেয়া মাদকব্যবহারকারীদের ভেতরে লিম্ফোট্রপিক ভাইরাসের সংক্রমণ বিষয়ক এক গবেষণা প্রকল্পে এই রক্তনমুনা ব্যবহৃত হয়। নুটকা আদিবাসীদের সম্মতিহীন তাদের রক্ত নানাবিধ গবেষণায় তাদের না জানিয়ে একতরফা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং তাদের রক্তনমুনা তাদের ফিরিয়ে দেয়ার দাবি তুলেছেন।[১০]

দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অরণ্যের এক আদিবাসী জনগোষ্ঠী ইয়ানুমামি। ১৯৬৭ সনে আমেরিকার নৃবিজ্ঞানী নেপোলিয়ান চ্যাংনন এবং জিনবিজ্ঞানী জেমস নীল ইয়ানুমামি আদিবাসীদের ভেতর তাদের রক্ত ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে এক গবেষণা প্রকল্পের ছুতোয় বসবাস করা শুরু করেন। তারা ১০০০ জন ইয়ানুমামি থেকে রক্তনমুনা সংগ্রহ করেন। রক্তনমুনা সংগ্রহের সময় বিভিন্ন পাত্র, তৈজস, কড়াই, বড়শি, দড়ি, দিয়াশলাই ও ছুরি ইত্যাদি উপহার হিসেবে দেয়া হয়। ইয়ানুমামিদের কাছ থেকে সংগৃহীত এই রক্তনমুনাগুলো গবেষণার জন্য ফ্রিজে বন্দী আছে এই কথা জানার পর ইয়ানুমামিদের ভেতর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রক্তের মতো পবিত্র জীবন্তসত্তা কোনোভাবেই গবেষণার নামে কোথায় বরফ ঠান্ডা হয়ে বন্দী থাকতে পারে না। আদিবাসীরা তাদের রক্ত ফেরতের দাবিতে সোচ্চার হন এবং এই রক্তের শেষকৃত্য আয়োজন জরুরি বলে দাবি তুলেন। আদিবাসীদের পক্ষে ব্রাজিল সরকার আমেরিকার সরকারের কাছে ইয়ানুমামি আদিবাসীদের রক্ত

[10] Rex Dalton, Tribe blasts 'exploitation' of blood samples, Nature volume 420, page 111, 14 November 2002

তাদের ফিরিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দেয়। ২০১০ সনের মে মাসে আমেরিকার পাঁচটি গবেষণাকেন্দ্র যেখানে ইয়ানুমামিদের রক্তনমুনা বন্দী করে রাখা আছে তারা ব্রাজিল সরকারের রক্ত ফেরতের প্রস্তাবকে সমর্থন করে। ইয়ানুমামিদের রক্ত ছিনতাইকারী আমেরিকার গবেষকদ্বয় দাবি করেছেন তারা এই রক্তনমুনার জেনেটিক বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করে দেখাতে চেয়েছিলেন ইয়ানুমামিরা বেরিং প্রণালী অতিক্রম করে এশিয়া থেকে আমেরিকায় হাজারো বছর আগে আদিপদাপর্ণকারীদের বংশধর।[১১]

বাংলাদেশে আদিবাসীদের রক্ত নিয়ে গবেষণা

বাংলাদেশে আদিবাসীদের রক্ত নিয়ে কী ধরনের জেনেটিক গবেষণা হয়েছে? হাতের নাগালে যে সামান্য কটি গবেষণার হদিশ পাওয়া যায় তাই হা করিয়ে দেয়ার মতো। এসব গবেষণার নৈতিকতা, পদ্ধতি, সম্মতি, প্রাণডাকাতি নিয়ে কোনো স্পষ্ট তথ্য জনগোষ্ঠীর কাছে নেই। কারণ তারা রক্ত দিয়েছেন, গবেষকেরা শহর থেকে আদিবাসী এলাকায় গিয়ে স্বাস্থ্যগত গবেষণার কথা বলে এইসব রক্তনমুনা গবেষণার সামগ্রিক তথ্য গোপন করে এককথায় ডাকাতি করে এনেছেন। আমরা এ পর্যায়ে এক এক করে বাংলাদেশের আদিবাসী রক্ত নিয়ে জেনেটিক গবেষণাগুলো দেখার চেষ্টা করবো।

ঢাকাস্থ বায়োটেক কনসার্ন নামের একটি বাণিজ্যিক জেনেটিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মো. শহিদুর রহমান ও জাহিদ ইকতিয়ার এবং ঢাকাস্থ নদার্ন ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের মো. মাসুদ রানা পটুয়াখালীর রাখাইন ও বান্দরবানের চাকমাদের মোট ১২৮ জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের রক্তনমুনা নিয়ে একটি বংশগতিধারা বিষয়ক জেনেটিক গবেষণায়[১২] জানান উল্লিখিত জনগোষ্ঠীর ভেতর জেনেটিক বংশগতিতে মিল আছে। তাদের গবেষণাটি ২০০৮ সনে 'জার্নাল অব এথনোবায়োলজিতে' প্রকাশিত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেসের বিজ্ঞানী গাজী নুরুন নাহার সুলতানা, রোকেয়া বেগম ও মো. আসাদুজ্জামান; একই

---

11 Indigenous tribe's blood returned to Brazil after decades, BBC, 3 April 2015, click: https://www.bbc.com/news/world-latin-america-32178286

12 Rahman, Md. Sahidur, Zahid, Ikhtiar , Rana, Md. Masud. 2008. Phylogenetic Analysis of Rakhain Tribe of Patuakhali District, Bangladesh, In: Journal of Ethnobiology,:https://ethnobiology.org/phylogenetic-analysis-rakhain-tribe-patuakhali-district-bangladesh

বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও বায়োটেকনলজি বিভাগ এবং দৃষ্টি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার নামক একটি এনজিওর মনিরা আখতার বান্দরবানের তঞ্চংগ্যা, খুমী, খিয়াং এবং ম্রো আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ৫৪ জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের রক্তনমুনা সংগ্রহ করেন। উল্লিখিত আদিবাসীদের রক্ত পরীক্ষা করে তারা দেখান খুমী ও খিয়াংরা জেনেটিক বৈশিষ্ট্যে অনেক কাছাকাছি এবং তঞ্চংগ্যা ও ম্রোরা জেনেটিক বৈশিষ্ট্যে কাছাকাছি। রক্তনমুনার এই জেনেটিক গবেষণায় তারা জানান দেন, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল ভারতের মধ্যাঞ্চল থেকে জেনেটিক বৈচিত্র্য পরিভ্রমণের এক উল্লেখযোগ্য দরজা। তাদের গবেষণাটি[১৩] ২০১৫ সনে 'বায়োরিসার্চ কমিউনিকেশনস' নামক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। উল্লিখিত গবেষণাপ্রবন্ধে তারা জানান, রক্তনমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে তারা হেলসিংকি ঘোষণা ১৯৮৩ অনুসরণ করেছেন। প্রবন্ধের কৃতজ্ঞতা অংশে তারা রক্তদাতাদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন এবং উল্লেখ করেন এক্ষেত্রে তাদের সম্মতি ('*kind consideration*' শব্দটি ব্যবহার করেছেন গবেষকেরা) ছিল। এছাড়াও তারা রেউজাউল করিম হাশমি, রনি মারমা এবং চিং মারমার কাছে রক্তনমুনা সংগ্রহ এবং রক্তদাতাদের সাক্ষাৎকারগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন ফিজিক্যাল, কেমিক্যাল, বায়োলজিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সেস এর গাজী নুরুন নাহার ও সৈয়দ সালেহীন কাদেরী; ভারতের হায়দ্রেবাদের 'সেন্টার ফর সেলুলার অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজির' রাকেশ তামাং, পন্ডিচেলভাম বীরাইয়া, শুভ্রাজ কাদাকারাইস্বামী, ব্রিজেশ কুমার যাদব, আলা জি রেড্ডি, দীপা সেলভি রানী, লালজি সিং এবং কুমারস্বামী থাঙ্গারাজ; ইস্টোনিয়ার টারটোর টারটো বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইভ্যুলুশনারি বায়োলজি বিভাগ এবং ইন্সটিটিউট অব মলিক্যুলার অ্যান্ড সেল বায়োলজির অজয় কুমার পাঠক; এস্তোনিয়ার 'এস্তোনিয়ান বায়োসেন্টারের' জ্ঞানেশ্বর চুবে ২০১৩ সনে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ির চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাদের কাছ থেকে রক্তনমুনা সংগ্রহ করে 'তিব্বতী-বর্মণ' ভাষিক পরিবারের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জেনেটিক কাঠামোর এক বিশদ গবেষণা করেন।

---

[13] Nurun Nahar Sultana, Rokeya Begum, M. Asaduzzaman, Tanvir Ahmad and Monira Akhtar, 2015, Genetic Analysis of Y-Chromosome 17 STR in Four Indigenous Populations from Bandarban, Bioresearch Communications, Volume 01, Issue 01, January 2015, click: http://www.bioresearchcommunications.com/first-issue.pdf, acceded on 12 February 2017

এদের ভেতর অজয় কুমার পাঠক টারটো বিশ্ববিদ্যালয় এবং এস্তোনিয়ার বায়োসেন্টারের সাথে যুক্ত এবং লালজি সিং হায়দ্রেবাদের ‘সেন্টার ফর সেলুলার অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বারতের বারানসির বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও হায়েদ্রাবাদের জিনোম ফাউন্ডেশনের সাথে জড়িত। তাদের গবেষণাপত্রটি[১৪] ‘পিএলওএস ওয়ান’ শীর্ষক একটি অনলাইন জার্নালে ২০১৩ সনে প্রকাশিত হয়। গবেষণা প্রবন্ধটি থেকে জানা যায়, তারা রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ির ১০৮ জন চাকমা, ৯৭ জন মারমা ও ৯৭ জন ত্রিপুরা ব্যক্তির প্রত্যেকের কাছ থেকে ৫ মি.লি করে রক্ত সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু রক্তসংগ্রহে রক্তদাতাদের কোনো পূর্বসম্মতি ছিল কীনা এবং হেলসিংকি ঘোষণা বা এরকম কোনো বায়োমেডিক্যাল গবেষণা সংক্রান্ত নীতি অনুসরণ করা হয়েছে কীনা প্রবন্ধে এর কোনো উল্লেখ নেই। তবে এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী সকলের লিখিত সম্মতিপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে বলে প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়।

এটি নিশ্চিত নয়, একটি জটিল জেনেটিক গবেষণায় রক্তদানকারী আদিবাসীরা কীভাবে সামগ্রিক তথ্য জেনে নিজেদের সম্মতি দিচ্ছেন? সম্মতিপত্রে স্বাক্ষর করার মানে কোনোভাবেই অন্ততপক্ষে এমন সংবদেনশীল গবেষণার ক্ষেত্রে ‘পূর্ণসম্মতি’ নয়, কারণ আদিবাসীদের কাছে রক্তনমুনা শেষমেষ জেনেটিক গবেষণার কোন পর্যায়ে ব্যবহৃত হতে পারে এ বিষয়ে বিশদ তথ্য ও বিশ্লেষণ থাকে না।

বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ইন্সটিটিউশনাল এথিক্যাল কমিটি অব দ্য সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেস’ এবং ভারতের হায়দ্রবাদের ‘সেন্টার ফর সেলুলার অ্যান্ড মলিক্যুলার বায়োলজি (সিএলআইআর) এই গবেষণাকে অনুমোদন করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের রক্তনমুনা পরীক্ষা করে তারা দেখান উল্লিখিত এই তিনটি তিব্বতী-বর্মণ ভাষী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভেতর জেনেটিক বৈশিষ্ট্যে মিল আছে। এই মিল উত্তর-পূর্ব ভারতের তিব্বতী-বর্মণ ভাষী জনগোষ্ঠীর সাথে সাদৃশ্যময়। আদিবাসীদের রক্তনমুনা পরীক্ষা করে তারা বলতে চেয়েছেন, বাংলাদেশ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের ভৌগলিক অবস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৈচিত্র্যময় জেনেটিক-মানচিত্র গড়ে তুলতে ভূমিকা রেখেছে। রক্তনমুনা থেকে

[14] Gazi NNS, Tamang R, Singh VK, Ferdous A, Pathak AK, et al. (2013) Genetic Structure of Tibeto-Burman Populations of Bangladesh: Evaluating the Gene Flow along the Sides of Bay-of-Bengal. PLoS ONE 8(10): e75064. doi:10.1371/journal.pone.0075064

জেনেটিক বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে প্যালিওলিথিক ও নিওলিথিক উপনিবেশ বুঝতে চেয়েছেন। পাশাপাশি তারা বুঝতে চেয়েছেন দক্ষিণ এশিয়ার তিব্বতী-বর্মণ ভাষিক পরিবারের নানা জনগোষ্ঠীর জেনেটিক ভিন্নতা কী কারণে ঘটেছে, ভাষাগত কারণে নাকি ভৌগলিক স্থানান্তরের জন্য।

একটি প্রশ্ন আসতে পারে বাংলাদেশের আদিবাসীদের রক্তনমুনা নিয়ে গবেষণায় আদিবাসী জাতিসমূহের কেউ নিজে জড়িত ছিলেন কি না? এক্ষেত্রে একটি গবেষণা নমুনার হদিশ পাওয়া যায়। রাঙামাটি জেনারেল হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক চাকমা জনগোষ্ঠীর গৌরব দেওয়ান ২০১১ সনে রাঙামাটি জেনারেল হাসপাতালের ব্লাডগ্রুপ রেজিস্টার থেকে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চংগ্যা ও বাঙালিদের রক্তের গ্রুপের তথ্য সংগ্রহ করে একটি গবেষণা করেন। তিনি রাঙামাটি জেনারেল হাসপাতালের রেজিস্টার বইতে ২০০৬ তেকে ২০১১ সনের ভেতর লিপিবদ্ধকৃত রোগীদের রক্তের গ্রুপের তথ্য থেকে এই গবেষণাটি করেন। এতে তিনি দেখতে পান চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ও তঞ্চংগ্যাদের রক্তের অ্যালিলিক বিন্যাস প্রায় একই রকমের ক্রমসজ্জায় সজ্জিত; যা বাঙালিদের থেকে ভিন্ন। গবেষক আদিবাসী ও বাঙালি উভয়ের ভেতরেই নেগেটিভ গ্রুপের রক্ত খুব কম দেখতে পান। গবেষণাটি ২০১৫ সনে 'দ্য ইজিপ্সিয়ান জার্নাল অব মেডিকেল হিউম্যান জেনেটিস' এ প্রকাশিত হয়েছে।[১৫]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিওলজি বিভাগের শিক্ষক ডা. দিলরুবা বেগম, সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজের ফিজিওলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মো. রুহুল আমিন, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ (এনআইসিভিডি) এর ফিজিওলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ফিরোজা বেগম, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব চাইল্ড হেলথের পেডিয়াট্রিকস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. সৈয়দ শফি আহমেদ, সিলেটের জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজের ফার্মাকোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. শরদিন্দু কান্তি সিনহা এবং দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের প্রভাষক ডা. মো. আবিদুর রহমান যৌথভাবে সিলেট বিভাগের বিষ্ণুপ্রিয়া-মৈতৈ পাঙান মণিপুরী এবং খাসি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রক্ত নিয়ে একটি গবেষণা করেন। গবেষণার জন্য তারা জুলাই ২০০৬ তেকে জুন ২০০৭ সনের

---

15 Dewan, Gourab. 2015, Comparative frequency and allelic distribution of ABO and Rh (D) blood groups of major tribal communities of southern Bangladesh with general population and their determinants, In: The Egyptian Journal of Medical Human Genetics (2015) 16, 141–147

ভেতর সিলেট বিভাগের সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলার মোট ১৬৩৮ জন খাসি, মৈতৈ, বিষ্ণুপ্রিয়া ও পাঙানদের কাছ থেকে রক্তনমুনা সংগ্রহ করেন। এক্ষেত্রে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার তিলকপুর, ভানুবিল ও ঘোড়ামারা গ্রামের বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের ৬৫৮ জন; একই উপজেলার মঙ্গলপুর, চিতলিয়া এবং সিলেটের শিবগঞ্জ থেকে ৪৬০ জন মৈতৈ মণিপুরী এবং একই উপজেলার জামিরাকনা ও রানীবাজার থেকে ৩১৬ জন পাঙান মোট ১৪৩৪ জন মণিপুরী ব্যক্তির কাছ থেকে রক্তনমুনা সংগ্রহ করা হয়। পাশাপাশি শ্রীমঙ্গল উপজেলার ধনছড়া ও জুলেখাছড়া পুঞ্জির ২০৪ জন খাসি ব্যক্তির কাছ থেকে রক্তনমুনা সংগ্রহ করা হয়। রক্তের গ্রুপ সণাক্তকরণের কথা বলে সকলকে এলাকার মন্ডপ এবং মন্ত্রী বা পুঞ্জিপ্রধানের ঘরে আসতে বলা হয়। পরবর্তীতে স্লাইডের পদ্ধতিতে প্রত্যেকের কাছ থেকে রক্ত নিয়ে ‘অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি অ্যাগ্লুটিনেশন’ পরীক্ষা করা হয়। গবেষণাটি ২০১১ সনে ঢাকা মেডিকেল কলেজের জার্নালে[১৬] প্রকাশিত হয়। গবেষণায় দেখা যায়, উল্লিখিত জনগোষ্ঠীর ভেতর আরএইচ বেশীরভাগই পজিটিভ এবং নেগেটিভ খুব কম। মৈতৈ এবং পাঙনদের ভেতর ‘এ’ গ্রুপ বেশি, বিষ্ণুপ্রিয়া এবং খাসিদের ভেতর ‘ও’ গ্রুপ বেশী। ‘এবি’ গ্রুপের মানুষ খুব কম। খাসিদের ভেতর কোনো নেগেটিভ গ্রুপের রক্তনমুনা পাওয়া যায়নি, তুলনামূলকভাবে বিষ্ণুপ্রিয়াদের ভেতর বেশি পাওয়া গেছে। এই বিশাল গবেষণার ক্ষেত্রেও ফ্রি-প্রাইওর-ইনফর্ড-কনসেন্ট নীতি অনুসরণ হয়েছে কীনা তা স্পষ্ট নয়। রক্তনমুনা গুলি কোথাও সংরক্ষণ করা হয়েছে কীনা এবং সেক্ষেত্রে জনগোষ্ঠী ও ব্যক্তির সম্মতি আছে কীনা তা জানা যায়নি।

একটি রক্ত-ডাকাতি গবেষণার খোঁজে

ঢাকাস্থ বায়োটেক কনসার্ন নামের একটি বাণিজ্যিক জেনেটিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মো. শহিদুর রহমান ও জাহিদ ইকতিয়ার এবং ঢাকাস্থ নদার্ন ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের মো. মাসুদ রানা পটুয়াখালীর রাখাইন ও বান্দরবানের চাকমাদের মোট ১২৮ জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের রক্তনমুনা নিয়ে একটি বংশগতিধারা বিষয়ক জেনেটিক গবেষণায়[১৭] জানান উল্লিখিত জনগোষ্ঠীর ভেতর

---

16 Begum D, Amin Mr, Khatun F, Ahmed SS, Sinha Sk, Rahman MA. 2011, Distribution of ABO and Rh Blood Groups Among Tribal Population of Sylhet, Bangladesh, in: J Dhaka Med Coll. Vol. 20, No. 1. April, 2011

জেনেটিক বংশগতিতে মিল আছে। তাদের গবেষণাটি ২০০৮ সনে 'জার্নাল অব এথনোবায়োলজিতে' প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণাটির বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ নেই ২০১৭ সনের মার্চে। নর্দার্ন ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ থেকে বলা হয় মো. মাসুদ রানা এখন এই হাসপাতালে কাজ করেন না, তিনি বিদেশ চলে গেছেন। বায়োটেক কনসার্ণের খোঁজ পেতে ঘাম বের হয়ে যায়। মো. শহিদুর রহমানকে পাওয়া যায় না, তিনিও বিদেশ চলে গেছেন। অনেক কষ্ট করে জাহিদ ইকতিয়ারকে পাওয়া যায়। একমাত্র তিনিই এই গবেষণাটি সম্পর্কে জানেন, তবে এই গবেষণাপত্রটি তার কাছে নেই বলে জানান। কারণ তিনি অনেক আগে এই কাজটি করেছিলেন, এখন সেই কাজটি তার পুরোপুরি মনে নেই। বিস্ময়কর! এতোগুলো মানুষের রক্তনমুনা নিয়ে একটি কাজ করা হলো আর সকলেই বেমালুম ভুলে গেলেন। গবেষণাপত্রটি পাওয়ার জন্য প্রায় দেড় বছর ধরে জাহিদ ইকতিয়ারের সাথে যোগাযোগ করেও তার কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। এর ভেতর তার সাথে নানাসময়ে ফোনে কথা বলেছি এবং ই-মেইল করেছি। প্রথম দিকে তিনি গবেষণাপত্রটি দিতে রাজি হয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে আর কোনো গুরুত্ব দেন নি।

যাহোক, এই গবেষণার সূত্র খুঁজতে দেশের দক্ষিণ উপকূলের রাখাইন জনপদ থেকে আমাদের একবার ঘুরে আসা জরুরি। নির্দয়ভাবে এই রাখাইন অধ্যুষিত অঞ্চল আজ রাখাইন শূন্য হয়ে পড়ছে। বর্তমানে পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলায় ২৮টি এবং গলাচিপা উপজেলায় ৪টি রাখাইন গ্রাম আছে। বরগুণা জেলার তালতলী ও সদরে ১৩টি রাখাইন গ্রাম আছে। বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলে রাখাইনদের জনমিতির সূত্রমতে মাত্র দুইশ বছরে, প্রায় ৮১ ভাগ রাখাইন গ্রাম বেদখল হয়ে রাখাইনশূন্য হয়েছে এবং রাখাইন জনসংখ্যা কমেছে প্রায় ৯৫ ভাগ।[১৮] তো এই রাখাইন জনপদ থেকেই ১২৮ জন মানুষের রক্ত নিয়ে গেছে একটি বেসরকারি বাণিজ্যিক জেনেটিক প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ। খুঁজতে খুঁজতে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার ৯নং ধুলাশ্বর ইউনিয়নের বৈতলী পাড়ায় এই রক্ত-ডাকাতির সন্ধান মিলে। বৈতল বা বৈতুলী পাড়ার বর্তমান মাতবর ওয়্যা মং। মুক্তিযুদ্ধের সময়

---

17 Rahman, Md. Sahidur, Zahid, Ikhtiar , Rana, Md. Masud. 2008. Phylogenetic Analysis of Rakhain Tribe of Patuakhali District, Bangladesh, In: Journal of Ethnobiology,:https://ethnobiology.org/phylogenetic-analysis-rakhain-tribe-patuakhali-district-bangladesh

১৮ পাভেল পার্থ, একটি রাখাইন প্রবাদ: বাংলাদেশের বরিশাল বিভাগের আদিবাসী রাখাইনদের ভূমিসংকট পর্যালোচনা, ত্রৈমাসিক প্রতিচিন্তা: অষ্টম বর্ষ প্রম সংখ্যা: জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮। পৃষ্ঠা: ৭৩-১২২। সম্পাদক: মতিউর রহমান। ৫২, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

এই গ্রামের ৪৫ পরিবার রাখাইন বসতি ছিল, বর্তমানে অর্ধেকে নেমে এসেছে। কোনো খেলায় যখন অনেকগুলো দল থাকে এবং যে দল সেখানে আগে খেলার সুযোগ পায় তাদের রাখাইন ভাষায় বৈতুলী বলে। বৈতুলীদের গ্রাম থেকেই এই রাখাইন গ্রামের স্থাননামটি হয়েছে। এই এলাকায় একসময় প্রসিদ্ধ খেলোয়াড়দের দল ছিল। খেলাধূলায় এলাকার সুনাম ছিল। গ্রামের থয়লা রাখাইন ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ বৈতুলী ও কবিরাজ। ২০০৭ সনে প্রলয়ংকরী জলোচ্ছ্বাস সিডরে পুরো দক্ষিণ উপকূল তছনছ হয়ে যায়। নানাজনে নানা ছল নিয়ে কখনো সাহায্য, কখনো ত্রাণ এভাবে সিডর-বিধ্বস্ত জনপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। উল্লিখিত গবেষণার গবেষকদলও সিডর বিধ্বস্ত এক জনপদে রক্ত-ডাকাতি করতে আসেন। রাখাইনদের একটি ঘরের বারান্দায়, কোথাও মাঠে ডাকা হয়। রাখাইনদের জানানো হয় এটি একটি স্বাস্থ্যপরীক্ষার 'ক্যাম্প'।

বৈতুলী গ্রামের থয়লা রাখাইন ও মাউসির ছেলে কবিরাজ সিত্যোমাও উল্লিখিত গবেষণায় বিবৃত (তথাকথিত) 'স্বাস্থ্য পরীক্ষার ক্যাম্পে' আসেন। সিত্যোমার ভাষ্য অনুযায়ী, গবেষকেরা রাখাইনদের মুখ হা করিয়ে তাদের দাঁত পরীক্ষা করে এবং দাঁতের মাড়ি থেকে চামড়া এবং রক্ত নেয়, তারা হাতের আঙুল থেকেও রক্ত নেয়। সিত্যোমা সেই গবেষকদের 'ডাক্তার' বলে উল্লেখ করেছেন, কারণ রাখাইনদের জানানো হয়েছিল সিডরের পর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করে বিনামূল্যে সবাইকে স্বাস্থ্যসেবা এবং ঔষধ সাহায্য দেয়া হবে। এবং এ কারণে এক ভলান্টিয়ার 'ডাক্তারেরা (গবেষকবৃন্দ)' ঢাকা থেকে সেখানে গিয়েছেন। সিত্যোমা আর কিছুই জানেননা। স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও দাঁত পরীক্ষার নামে গবেষকরা যে রাখাইনদের নমুনা সংগ্রহ করেছেন, সেখানে কোনো ধরণের পূর্ণ সম্মতি ছিল না। গবেষকেরা ভিন্ন উদ্দেশ্যে দাঁত-পরীক্ষার নামে রক্তসংগ্রহ করবেন এই বিষয়টি আগে জনগোষ্ঠীর সাথে আলোচনা করা হয়নি। এমনকি সরকারি কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সরকার এবং সরকারি হাসপাতাল ও কমিউনিটি ক্লিনিক কেউ এ গবেষণার বিষয়ে আগে থেকে জানতেন না।

এই রক্তনমুনা নিয়ে গবেষকরা যে বান্দরবানের চাকমাদের সাথে তুলনা করবেন এটিও রাখাইনদের আগে থেকে জানানো হয়নি। এমনকি এই রক্তনমুনা কোথায় কীভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে নাকি এইসব নমুনা নষ্ট করে ফেলা হয়েছে তাও রাখাইনরা জানেন না। তাদের রক্তনমুনা থেকে করা সকল জেনেটিক তথ্য এবং গবেষণা প্রতিবেদন কোনো রাখাইন চোখেও দেখেননি, তারা এসব বিষয়ে জানেন না বলে সরেজমিনে[১৯] জানা যায়।

অ্যারিজোনা বোর্ড অব রিজেন্টস বনাম হাবাসুপাই আদিবাসী মামলা[২০]

আদিবাসীদের রক্ত নিয়ে যে প্রশ্নহীন জেনেটিক গবেষণা বাহাদুরি চলছে এর বিরুদ্ধ বৈশ্বিক জনমত তৈরি হয়েছে। জাতিরাষ্ট্রসমূহ নানা নীতি ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। আমেরিকার বিখ্যাত পর্বতাঞ্চল গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের টার্ক্যুইজ জলপ্রপাত এলাকার এক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নাম হাবাসুপাই। ১৯৮৯ সনে আমেরিকার অ্যারিজোনা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন অঞ্চলে হাবাসুপাই আদিবাসীদের ভেতর টাইট-২ ডায়াবেটিস নিয়ে একটি গবেষণা প্রকল্প শুরু করে। তারা হাবাসুপাইদের ভেতর স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে এবং আদিবাসীদের রক্ত নমুনা সংগ্রহ করে। গবেষকরা হাবাসুপাইদের প্রথমে জানায়, রক্তনমুনার জেনেটিক পরীক্ষা করে গবেষকরা দেখতে চান টাইপ-২ ডায়াবেটিস এর সাথে হাবাসুপাইদের রক্ত থেকে প্রাপ্ত ডিএনএর কোনো সম্পর্ক আছে কীনা। ২০০৩ সনে হাবাসুপাইদের একজন নারী সদস্য কার্লেটা তিলৌসি উল্লিখিত প্রকল্পের একটি উপস্থাপন সভায় এসে জানতে পারেন তাদের কাছ থেকে সংগৃহীত রক্তনমুনা তাদের না জানিয়ে অন্যান্য নানামুখী গবেষণায় ব্যবহার করা হচ্ছে। কথা ছিল এই রক্ত কেবলমাত্র টাইপ-২ ডায়াবেটিস গবেষণার জন্য ব্যবহৃত হবে। কিন্তু এই রক্ত নিয়ে গবেষকরা সিজোফ্রেনিয়া, স্থানান্তর এবং আন্ত:প্রজনন এরকম গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

রক্ত সম্পর্কিত এরকমের বিষয়গুলো হাবাসুপাই আদিবাসীদের কাছে জাতিগতভাবে পবিত্র এবং এসব ঘিরে তাদের সমাজে নানাধরণের 'ট্যাবু বা সামাজিক নিষেধাজ্ঞা' আছে। এ বিষয়টি নিয়ে কার্লেটা তার সমাজে আলোচনা

---

১৯ বৈতুলী গ্রামে রাখাইনদের সাথে আলাপকালে এমন নির্দয় তথ্যগুলো হাজির করেন রাখাইনরা। ১৯ মার্চ ২০১৭।

২০ ন্যাশনাল কংগ্রেস অন অ্যামিরিকান ইন্ডিয়ানস সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত 'অ্যমিরিকান ইন্ডিয়ান এ আলাস্কান জেনেটিক রিসোর্স সেন্টারের' অনলাইন ওয়েবপোর্টাল থেকে এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানা যেতে পারে। http://genetics.ncai.org/case-study/havasupai-Tribe.cfm, সাইটটিতে প্রবেশ করা হয়েছে: ১৫ মার্চ ২০১৭।

Amy Harmon, Indian Tribe Wins Fight to Limit Research of Its DNA, The New York Times, 21 April 2010, click: https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/2010/04/22/us/22dna.html

Erin Blakemore, Why the Navajo Nation Banned Genetic Research, History Stories, November 03, 2017:https://www.history.com/news/why-the-navajo-nation-banned-genetic-research

করেন এবং ২০০৪ সনে তিনি হাবাসুপাইদের পক্ষে অ্যারিজোনা বোর্ড অব রিজেন্টসে একটি অভিযোগ মামলা দায়ের করেন। উক্ত মামলায় আদালতে আদিবাসীদের পূর্ণসম্মতি ছাড়া তাদের রক্ত নিয়ে নানাবিধ গবেষণা, রক্তনমুনাকে ভিন্নভাবে ব্যবহারের ভেতর দিয়ে মৌলিক মানবাধিকার লংঘন, অনুমোদনহীন তথ্যের ব্যবহার এবং চিকিৎসা গবেষণার গোপনীয়তা লংঘন প্রমাণিত হয়। দীর্ঘসময় ধরে মামলাটি আদালতে চলমান থাকে। আদিবাসী রক্ত নিয়ে জেনেটিক গবেষণার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক নানা তর্ক শুরু হয়। ২০১০ সনের এপ্রিলে অ্যারিজোনা আদালত হাবাসুপাই আদিবাসীদের পক্ষে রায় ঘোষণা করে। হাবাসুপাই আদিবাসীদের প্রায় সাত লাখ মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় তাদের এলাকায় চিকিৎসাকেন্দ্র ও বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য এবং আদিবাসী সমাজে আবারো তাদের কাছ থেকে সংগৃহীত ডিএনএ ও রক্তনমুনা ফিরিয়ে দেয়া হয়।

আদিবাসী রক্তের ন্যায়বিচার

রক্তনমুনা ও জেনেটিক পরীক্ষা কোনোভাবেই কাউকে ‘নেটিভ’ বা দেশজ বা ‘আদিবসতিস্থাপনকারী’ প্রমাণে কোনো কার্যকর উপায় নয়।[২১] এক্ষেত্রে প্রতিটি জনগোষ্ঠীর নিজেদের বিকাশের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঐতিহাসিকতা ও যাপিতজীবনের বিবরণ খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। টলবিয়ার (২০০৩) দেখান, আদিবাসীদের রক্তনমুনা এবং ডিএনএ বিশ্লেষণ বিষয়ক প্রকল্পগুলো সবসময়ই আদিবাসীদের উপর ব্যক্তি বা অন্যান্য সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে শক্তিশালীকরণের কৌশল। যাতে আদিবাসীরা এসব কর্তৃত্বকে কখনোই চ্যালেঞ্জ না করতে পারে। কিন্তু আদিবাসীদের নাগরিকত্ব নির্ধারণ, রাজনৈতিক অধিকার এবং সমৃদ্ধ সংস্কৃতি বিকাশে আরো অনেক কৌশল আছে। যেখানে অর্থনৈতিক বিনিয়োগ থেকে শুরু করে আদিবাসী সমাজের সামাজি প্রতিশ্রুতিগুলোকে গুরুত্ব দেয়া জরুরি। এক্ষেত্রে আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত রীতিগুলোর স্বীকৃতি তাদের বিকাশের একটি ভাল উপায়।[২২] বাংলাদেশে আদিবাসী জনগণের আত্মপরিচয়ের মতো মৌলিক বিষয়ের কোনো স্বীকৃতি নেই, অথচ এই রাষ্ট্রেই আদিবাসীদের জেনেটিক

21 Brett Lee Shelton and J onathan Marks, "Genetic 'Markers'-Not a Valid Test of Native Identity," at http://www.ipcb.org, May 2001

22 TallBear, Kimberly. 2003, DNA, Blood, and Racializing the Tribe, Wicazo Sa Review, Vol. 18, No. 1 (Spring, 2003), pp. 81-107

পরিচয় জানতে মরিয়া হয়েছে অনেক প্রকল্প। অথচ তাদের কখনোই আদিবাসী আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে একটা উচ্চারণও করতে দেখা যায়নি। যে দেশে আদিবাসীরা ন্যূনতম মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা পায়না, সেখানে আদিবাসীদের রক্তের ডিএনএর আদ্যপ্রান্ত জানতে মরিয়া হয়েছে কোনো কোনো গবেষক ও চিকিৎসক।

চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডের পাহাড়ি এলাকায় ২০১৭ সনের জুলাই মাসে একের পর এক ত্রিপুরা শিশুরা হাম বা রাষ্ট্রকথিত এক 'অজ্ঞাত' রোগে নিহত হওয়ার পর রাষ্ট্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষও ত্রিপুরা আদিবাসীদের বসতিগুলোকে 'দুর্গম' ও প্রত্যন্ত বলে চিহ্নিত করেন। বাংলাদেশে আদিবাসী বিষয়ে প্রকাশিত/অপ্রকাশিত নানাবিধ গবেষণা-বাহাদুরিগুলোতে দেখা যায় সবসময় আদিবাসী অঞ্চল গুলো 'দুর্গম' হিসেবেই চিহ্নিত হয়। সীতাকুন্ড পাহাড়ে রাষ্ট্রের অবহেলায় ত্রিপুরা শিশুরা মারা যাওয়ার পর চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন আজিজুর রহমান সিদ্দিকী 'বিবিসি-বাংলাকে' জানান, তারা রোগটি সম্পর্কে কোনো পরিস্কার ধারণা করতে পারছেন না। যে এলাকায় রোগটি হানা দিয়েছে সেটি খুব দুর্গম ও প্রত্যন্ত, গাড়ি থেকে নেমে অন্তত দেড়-দু'মাইল হেঁটে সেখানে পৌঁছতে হয় (সূত্রঃ বিবিসি-বাংলা, ১২ জুলাই ২০১৭)। স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. আবুল কালাম আজাদগণমাধ্যমকে জানান, সীতাকুন্ডে কয়েক গোষ্ঠীর মানুষ বিচ্ছিন্ন এলাকায় বসবাস করত। এ কারণে তারা আধুনিক শিক্ষা থেকে দূরে ছিল। বাচ্চাদের রোগবালাই ও চিকিৎসার বিষয়ে কোনও তথ্য জানতো না।[২৩] 'দুর্গম' হিসেবে চিহ্নিত হলেও আদিবাসীদের রক্ত-ডাকাতির জন্য দশাসই প্রকল্পগুলোর কাছে আদিবাসী জনপদ কী আদিবাসী শরীর কোনো 'দুর্গম' অঞ্চল নয়। এই শরীর যেকোনোভাবে ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ধর্ষণ, খুন কী এই শরীরের জিনসম্পদ একতরফাভাবে পেটেন্ট করা যায়। কেবল আদিবাসী নয়, দেশজুড়ে গরিব নিম্নবর্গের উপর এমন নানাবিধ প্রশ্নহীন বায়োমেডিক্যাল গবেষণা ঘটেই চলেছে। 'আন্তজার্তিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র' কর্তৃক কালাজ্বর ও কলেরা রোগের ঔষধ পরীক্ষণ ট্রায়ালকে প্রশ্ন করে পার্থ (২০০৫) জানান, দরিদ্র মানুষের শরীরে কর্পোরেট কোম্পানি নিয়ন্ত্রিত এইসব প্রশ্নহীন বায়োমেডিক্যাল গবেষণা বন্ধ হওয়া জরুরি।[২৪]

২৩ পাভেল পার্থ, 'হামে' নিহত ত্রিপুরা শিশুরা কী প্রমাণ করল?, অনলাইনভিত্তিক পোর্টাল আইপিনিউজবিডিডটকম, ২০ জুলাই ২০১৭, ক্লিক করুনঃ http://ipnewsbd.com/news/3546

২৪ পাভেল পার্থ, দরিদ্র মানুষের শরীরে প্রশ্নহীন বায়োমেডিক্যাল গবেষণা, ২০০৫, দৈনিক সমকাল. ঢাকা

বায়োমেডিক্যাল ও জেনেটিক গবেষণার ক্ষেত্রে যেখানে মানুষের শরীর বা শরীরের কোনোকিছু ব্যবহৃত হয় সেক্ষেত্রে হেলসিংকি ঘোষণার নীতি পালন একটি প্রাথমিক আবশ্যকতা, এটি বাংলাদেশের জন্যও জরুরি। কিন্তু আদিবাসীদের রক্ত নিয়ে করা জেনেটিক গবেষণাসমূহে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই হেলসিংকি ঘোষণার নীতি মানা হয়নি। ১৯৬৪ সালের জুন মাসে ফিনল্যান্ডের হেলসিংকিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব মেডিক্যাল এসেম্বলির ১৮তম সম্মেলনে মানুষের শরীরের উপর বায়োমেডিক্যাল পরীক্ষা নিরীক্ষার উপর বিধি বিধানসহ এক আন্তর্জাতিক সনদ তৈরি হয়, পরবর্তীতে যা হেলসিংকি ঘোষণা হিসেবে পরিচিত হয়। ১৯৭৫ সালের অক্টোবরে জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব মেডিক্যাল এসেম্বলির ২৯তম সম্মেলনে এই সনদ আন্তর্জাতিক ভাবে অনুমোদিত হয় এবং ১৯৮৩ সালের অক্টোবরে ইটালির ভেনিসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব মেডিক্যাল এসেম্বলির ৩৫তম সম্মেলনে এই ঘোষণাকে মানুষের শরীরে বায়োমেডিক্যাল পরীক্ষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিবেচনার জন্য কার্যকরী আহবান রাখা হয়। হেলসিংকি ঘোষণার (Declaration of Helsinki 1964) মৌলিক মূলনীতির ৯ নং ধারায় স্পষ্টভাবে উলেখ করা হয়েছে, যে, মানুষের উপর যেকোনো ধরনের বায়োমেডিক্যাল গবেষণার ক্ষেত্রে যার বা যাদের উপর এই নিরীক্ষা করা হচ্ছে তার বা তাদেরকে নিরীক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, ফলাফল এবং প্রভাব সম্পর্কে পূর্বেই সম্যক ধারণা দিতে হবে। নিরীক্ষা সম্পর্কে গবেষিতের অবশ্যই পূর্ব অনুমতি ও সমর্থন থাকা আবশ্যক, যার উপর নিরীক্ষা কার্যক্রম চলছে তিনি স্বেচ্ছায় চাইলে যেকোনো সময় নিজেকে নিরীক্ষা কার্যক্রম থেকে সরিয়ে নিতে পারেন। এক্ষেত্রে গবেষিতের স্বাধীনতাই মূখ্য। হেলসিংকি ঘোষণায় যেকোনো বায়োমেডিক্যাল পরীক্ষণের ক্ষেত্রে চিকিৎসক বা গবেষকের নিরীক্ষা প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা ও অভিজ্ঞতা থাকার কথা বলা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি (২০০০)'র ২২ নং অনুচ্ছেদে উলেখ করা হয়েছে, স্বাস্থ্য সেবার সাথে সম্পৃক্ত সকলের জবাবদিহিতা আরও জোরালো করতে হবে। এই লক্ষ্যে একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হবে, যার মাধ্যমে জবাবযোগ্যতা আরও নিশ্চিত হয় এবং প্রয়োজনে কাজে গাফিলতির জন্য ত্বরিৎ গতিতে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

কোনো ব্যক্তির ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণের প্রশ্নে বাংলাদেশ ২০১৪ সনে ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন প্রণয়ন করে। এই আইনের ১২নং ধারা অনুযায়ী, সণাক্তকরণ, কোনো অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো

ব্যক্তি, অজ্ঞাত বা নিখোঁজ ব্যক্তি সনাক্তকরণ, দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ, প্রাকৃতিক দূর্যোগে মৃত ব্যক্তি সনাক্তকরণ, বিরোধ নিষ্পত্তি ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো বিষয় ছাড়া কোনো ব্যক্তির ডিএনএ প্রোফাইল ব্যবহার আইনত নিষিদ্ধ।

দেখা যায় বাংলাদেশের আদিবাসীদের রক্তনমুনা থেকে করা জেনেটিক গবেষণা গুলোতে নানাভাবে আদিবাসী ব্যক্তিদের ডিএনএ প্রোফাইলকে ব্যবহার ও ব্যাখা করা হয়েছে, যা রাষ্ট্রের ডিএনএ আইন (২০১৪) এর সাথে সাংঘর্ষিক। তাহলে কী এই আইন অনুযায়ী সেসব গবেষণা বাতিল হবে এবং গবেষণার সকল তথ্য না জানিয়ে যেসকল আদিবাসীদের কাছ থেকে রক্তনমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে তারা এখন ক্ষতিপূরণ ও রক্তনমুনা ফেরত পাবেন?

রাষ্ট্র মানুষসহ সকল প্রাণের চারধারের জগত থেকে শুরু করে প্রতিজনের শরীরের সীমানার সুরক্ষা দিতে সাংবিধানিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাহলে দেশের আদিবাসী জনপদে সম্মতিহীন এসব জেনেটিক গবেষণার অনুমোদন দিচ্ছে কে? এসব জেনেটিক গবেষণা কেবলমাত্র নৈতিকতার প্রশ্নে নয়, আদিবাসী সাংস্কৃতিক অবয়ব ও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকেও অন্যায়ভাবে ধাক্কা মেরেছে। দ্রুত এ বিষয়ে একটা জাতীয় নীতিগত অবস্থান তৈরি করা জরুরি।

পাভেল পার্থ, গবেষক, প্রতিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্য সংরক্ষণ

নুপি লান; মণিপুরে নারীপ্রতিবাদের রাজনৈতিক রূপান্তর ও মৈতৈ পাঙাল নারীরা

হামোম প্রমোদ

ভূমিকা

নুপি লান মণিপুরের ইতিহাসে এমন এক ঘটনা, যা শুধু একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বোঝা যায় না। এটি এক দীর্ঘ সামাজিক প্রস্তুতি, অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক চেতনার সমষ্টিগত বিস্ফোরণ। এই আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রচলিত ইতিহাসচর্চার সীমা অতিক্রম করতে হয়, কারণ এখানে নেতৃত্বে ছিলেন সাধারণ নারী, যাঁরা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না, অথচ রাষ্ট্রক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস ও সংগঠন তাঁদের ছিল।

অনেক লেখক, বিশ্লেষক এবং ঐতিহাসিকরা নুপি লানকে কেবল ‘নারী বিদ্রোহ’ বা ‘খাদ্য আন্দোলন’ হিসেবে ব্যাখ্যা করে থাকেন, যা ঐতিহাসিকভাবে অপর্যাপ্ত। বরং এটি ছিল একটি ‘নারী নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া’, যা মণিপুরে আধুনিক গণতান্ত্রিক কল্পনার বীজ বপন করে। এখানে নারী কেবল সামাজিক ভূমিকার প্রতীক নন; তাঁরা ইতিহাসের সক্রিয় নির্মাতা।

আমরা সাধারণত ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক পরিবর্তনের কৃতিত্ব দেওয়া হয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পুরুষ নেতৃত্বকে। কিন্তু নুপি লান এই ধারণাকে ভেঙে দেয়। এটি দেখায়- রাজনৈতিক চেতনা কেবল শহুরে এলিট পরিসরে জন্ম নেয় না; বরং বাজার, পরিবার ও দৈনন্দিন শ্রমের ভেতর দিয়েও রাজনৈতিক বোধ গড়ে উঠতে পারে।

নুপি লান এর ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণ করলে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচিত হয় যে, এই আন্দোলনের নেতৃত্ব কোনো রাজা, জমিদার বা শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণির হাতে ছিল না। বরং এটি গড়ে ওঠে বাজারের নারী, কৃষক পরিবারের নারী ও শ্রমজীবী মহিলাদের সম্মিলিত উদ্যোগে। তাঁদের বক্তব্য, দাবি ও কৌশল ছিল

রাষ্ট্রের লিখিত নথির বাইরে, কিন্তু সামাজিক বাস্তবতায় অত্যন্ত শক্তিশালী। একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, নুপি লান ছিল ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক শোষণ, সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে নারীনেতৃত্বাধীন গণপ্রতিরোধ- যা মণিপুরে আধুনিক গণতান্ত্রিক চেতনার ভিত্তি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রাক-ঔপনিবেশিক মণিপুরের সমাজ ও অর্থনীতিতে নারীর ভূমিকা

নুপি লানের তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে প্রাক-ঔপনিবেশিক মণিপুরে নারীর অবস্থান বোঝা জরুরি। মণিপুরী সমাজে নারী কেবল গৃহকেন্দ্রিক ছিলেন না; বরং অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের কেন্দ্রে অবস্থান করতেন। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ ইমা কেইথেল বা খ্বাইরামবন্দ বাজার একটি সম্পূর্ণ নারীনিয়ন্ত্রিত বাজারব্যবস্থা। এই বাজার ছিল কেবল পণ্য বিনিময়ের স্থান নয়; এটি ছিল সামাজিক যোগাযোগ, নৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্র।

এই বাজার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নারীরা যে সম্মিলিত চেতনা ও সাংগঠনিক দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, তা পরবর্তীকালে রাজনৈতিক প্রতিবাদের ভিত্তি তৈরি করে। ফলে নুপি লান কোনো আকস্মিক আবেগী বিস্ফোরণ নয়; বরং দীর্ঘদিনের সামাজিক অনুশীলনের রাজনৈতিক রূপান্তর।

ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপ ও অর্থনৈতিক রূপান্তর

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন মণিপুরে যে অর্থনৈতিক কাঠামো প্রবর্তন করে, তা স্থানীয় সমাজের স্বাভাবিক ভারসাম্যকে ভেঙে দেয়। চাল রপ্তানি, কোর্ট ট্যাক্স, লাল পাস ব্যবস্থা এবং বহিরাগত ব্যবসায়ীদের প্রবেশের ফলে খাদ্য ও বাজারব্যবস্থা রাষ্ট্র ও পুঁজির নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। চাল এখানে কেবল খাদ্যদ্রব্য ছিল না; এটি হয়ে ওঠে রাষ্ট্রক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। আর এই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় অভিঘাত পড়ে নারীদের ওপর। একদিকে সংসারের খাদ্যনিরাপত্তা বিপন্ন হয়, অন্যদিকে বাজারে তাঁদের ঐতিহ্যগত কর্তৃত্ব ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ নারীরা একই সঙ্গে ভোগ করেন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার সংকট। এই দ্বৈত সংকটই নুপি লানের অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্মাণ করে।

প্রথম নুপি লান (১৯০৪): স্মৃতি ও রাজনৈতিক উত্তরাধিকার

১৯০৪ সালের প্রথম নুপি লান ছিল জোরপূর্বক শ্রম ও প্রশাসনিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে নারীদের সম্মিলিত প্রতিবাদ। যদিও এই আন্দোলন তুলনামূলকভাবে

স্বল্পস্থায়ী ছিল, তবু এটি নারীদের রাজনৈতিক সক্ষমতার একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- এই আন্দোলনের স্মৃতি মণিপুরী সমাজে প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং বলা যায় যে, ১৯৩৯ সালের ২য় নুপি লান এই স্মৃতির ওপর দাঁড়িয়েই বিকশিত হয়। এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং পূর্ববর্তী প্রতিরোধের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার।

নিখিল মণিপুরি মহাসভা ও রাজনৈতিক আধুনিকতা

১৯৩০-এর দশকে প্রতিষ্ঠিত নিখিল হিন্দু মণিপুরি মহাসভা মণিপুরে রাজনৈতিক আধুনিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। প্রাথমিকভাবে এটি সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কারের সংগঠন হলেও, শিগগিরই এর ভেতরে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়। মহারাজা চূড়াচাঁদ সিংহ এই সংগঠনকে জননিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চাইলেও, হিজম ইরাবত সিংহের নেতৃত্বে একাংশ এটিকে গণরাজনীতির মঞ্চে রূপ দিতে উদ্যোগী হন এবং তিনি অনেকটা সফলও হয়। পরবর্তী কার্যকলাপ তাই প্রমান করে। জননেতা হিজম ইরাবতের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব কর্তৃত্ববাদী রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ, বিরোধী জোট গঠন, এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা হয়, যা অর্থনৈতিক বৈষম্য, জবাবদিহিতার অভাব, ও দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের দাবি তোলে। এই দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে নারীদের আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। নুপি লান রাজনৈতিক সংগঠনগুলিকে বাধ্য করে জনস্বার্থ, খাদ্যনীতি ও প্রশাসনিক জবাবদিহির প্রশ্ন সামনে আনতে।

১৯৩৯-১৯৪০: খাদ্যসংকট থেকে গণঅভ্যুত্থান

১২ ডিসেম্বর ১৯৩৯ সালে চালের মূল্যবৃদ্ধি ও রপ্তানির বিরুদ্ধে নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ থেকেই দ্বিতীয় নুপি লানের সূচনা। প্রশাসনের উদাসীনতা এবং মহারাজার অনুপস্থিতির অজুহাত আন্দোলনকে আরও তীব্র করে তোলে। নারীরা প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও করেন, টেলিগ্রাফ অফিস অবরোধ করেন এবং এমনকি নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তাদের আটকে রাখেন। এই ঘটনাগুলি দেখায় যে নুপি লান কেবল আবেগপ্রসূত প্রতিবাদ ছিল না; এটি ছিল কৌশলগতভাবে সংগঠিত এক গণআন্দোলন।

রাষ্ট্রীয় দমন ও আন্দোলনের রূপান্তর

ব্রিটিশ প্রশাসন বেয়নেট চার্জ, গ্রেপ্তার ও সহিংসতার মাধ্যমে আন্দোলন দমন করতে চাইলেও তা উল্টো ফল বয়ে আনে। নারীদের ওপর সহিংসতা আন্দোলনের নৈতিক বৈধতাকে আরও দৃঢ় করে এবং সাধারণ জনগণের সহানুভূতি অর্জন করে। এই পর্যায়ে নুপি লান খাদ্যনীতি থেকে রাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে রূপান্তরিত হয়। প্রশাসনিক দুর্নীতি, সামন্ততান্ত্রিক শাসন এবং সাংবিধানিক সংস্কারের দাবি আন্দোলনের কেন্দ্রে আসে।

লিঙ্গ, নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক কল্পনা ও গণতান্ত্রিক উত্তরাধিকার

নুপি লানের সবচেয়ে মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো এর নেতৃত্ব কাঠামো। এখানে নেতৃত্ব ছিল সমষ্টিগত, নৈতিক এবং দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত। নারীরা কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের মুখপাত্র না হয়েও রাজনৈতিক কল্পনার নতুন রূপ নির্মাণ করেন। এই আন্দোলন প্রমাণ করে যে নারী নেতৃত্ব কেবল বিকল্প নয়; অনেক ক্ষেত্রে এটি অধিক অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর। নুপি লান ছাড়া মণিপুরে ১৯৪৮ সালের পূর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারভিত্তিক নির্বাচন কল্পনাতীত। এই আন্দোলন প্রশাসনকে বাধ্য করে শাসনব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে ভাবতে। যদিও ১৯৪৯ সালে ভারতের সঙ্গে সংযুক্তির মাধ্যমে মণিপুরের নির্বাচিত সরকার বিলুপ্ত হয়, তবু নুপি লানের গণতান্ত্রিক চেতনা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়নি।

আন্দোলনে মৈতৈ পাঙালদের অংশগ্রহণ ও মৈতৈ পাঙাল নারীদের ভূমিকা

১৯০৪ সালের প্রথম নুপি লান এবং ১৯৩৯-১৯৪০ সালের দ্বিতীয় নুপি লান এই দুই আন্দোলন ছিল বহুত্ববাদী ও শ্রেণিভিত্তিক। মণিপুরের সংখ্যাগুরু মৈতৈ জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি মণিপুর রাজ্যে বসবাসরত অপরাপর বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল। বিভিন্ন গবেষণা ও লোকজ স্মৃতি (oral history) প্রকাশিত হলে দেখা যায় যে এই আন্দোলনের মৈতৈ পাঙাল (মণিপুরি মুসলমান) সম্প্রদায় সহ আরও অনেক সম্প্রদায় বা জাতিগোষ্ঠী, যারা কৃষি, বাজার ও তাঁতশিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নুপি লানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিসরে গভীরভাবে সংযুক্ত ছিলেন।

এখানে, বিশেষ করে মৈতৈ পাঙালদের অংশগ্রহণ নিয়ে তথ্যনির্ভর কিছু আলোচনা করছি। তথ্যসুত্র হিসেবে পর্যালোচনা করেছি, (ক) e-pao.net-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ, নিবন্ধ; খ) পোক্‌নফম / Poknapham ও হুইয়েন লানপাও /

Huiyen Lanpao-এ প্রকাশিত চিঠি ও প্রতিবেদন; (গ) Manipur State Archives ও সরকারি পত্রাচার (২০১৫-২০২১); (ঘ) মৌখিক ইতিহাস ও স্মৃতিচারণ; (ঙ) কয়েকটি একাডেমিক প্রবন্ধ (Sanamani Yambem; P. Kayamuddin, Dr Syed Ahmed); (ঙ) ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিক পোষ্ট এবং তথ্যাদি।

মৈতৈ পাঙাল সম্প্রদায়- ঐতিহাসিক বিকাশ ও সামাজিক সংযুক্তি

মৈতৈ পাঙাল সম্প্রদায়ের উৎপত্তি মণিপুরের ইতিহাসে সপ্তদশ শতকের শেষভাগে খুঁজে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক সূত্র অনুযায়ী, বিভিন্ন সময় বাংলার, কাছার ও আসামের দিক থেকে আগত মুসলমান সৈনিক, কারিগর ও ব্যবসায়ীরা মণিপুরের রাজসেবায় নিযুক্ত হন এবং পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। রাজা খাগেম্বার সময় থেকেই এই জনগোষ্ঠী 'পাঙাল' নামে পরিচিত হয়। (মৈতৈ পাঙালদের নিয়ে বিস্তারিত বলার এখানে অবকাশ নেই, আগ্রহীরা এ বিষয়ে সংযুক্ত গ্রন্থপঞ্জি থেকে পড়ে নেবেন)।

ধর্মীয়ভাবে তারা মুসলমান হলেও ভাষা, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস ও দৈনন্দিন সামাজিক রীতিতে তারা মৈতৈ সমাজের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে ওঠে। লিলোং, মিনুথোং, ময়া ইম্ফাল, ওয়াঙ্গোয় ও থৌবাল অঞ্চলে পাঙাল বসতির বিস্তার ঘটে। এই এলাকাগুলো কৃষি ও বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল, যা পরবর্তীকালে নুপি লানের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

ঔপনিবেশিক যুগে পাঙাল সমাজের অধিকাংশ মানুষ যুক্ত ছিলেন-

* ধানচাষ ও কৃষিশ্রমে,
* তাঁত ও সূক্ষ্ম বস্ত্র উৎপাদনে,
* স্থানীয় বাজারে ক্ষুদ্র ব্যবসায়।

এই বহুমুখী অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততা তাদের নুপি লানের দাবির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই যুক্ত করে। পাঙাল কৃষক পরিবারগুলোর মধ্যে নুপি লানের দাবির প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন তৈরি করে। যদিও তারা সরাসরি নেতৃত্বে ছিলেন না, তবু তাদের সামাজিক অবস্থান আন্দোলনের শ্রেণিগত ভিত্তিকে শক্তিশালী করে।

রাজনৈতিক সংগঠন, হিজম ইরাবত ও মৈতৈ পাঙাল সমাজের সংযোগ

নুপি লানের সময় মণিপুরে কার্যকর একমাত্র সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তি ছিল নিখিল মণিপুরি মহাসভা, হিজম ইরাবত সিংহের নেতৃত্বে এই সংগঠন ধীরে ধীরে সামন্ততন্ত্র ও ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। যদিও মহাসভার নেতৃত্ব মূলত মৈতৈ সমাজ থেকে উঠে আসে, তবু তাদের রাজনৈতিক ভাষা-অর্থনৈতিক শোষণ, খাদ্যনীতি ও কৃষক-শ্রমিকের অধিকার মৈতৈ পাঙাল সমাজের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ ছিল।

e-pao dot net –এ প্রকাশিত কিছু প্রবন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে লিলোং ও ময়াং ইম্ফাল এলাকার শিক্ষিত মৈতৈ পাঙাল যুবকদের একটি অংশ ইরাবতের সভা ও আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকতেন। তারা সরাসরি নেতৃত্বে না এলেও রাজনৈতিক ভাষার সঙ্গে পরিচিত হন এবং নুপি লানের দাবিকে বৃহত্তর উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে দেখতে শেখেন।

এখানে লক্ষণীয় যে মৈতৈ পাঙাল সমাজের অংশগ্রহণ ছিল মূলত সহযোগী ও সমর্থনমূলক, যা আন্দোলনের সাম্প্রদায়িক রূপ নেওয়ার সম্ভাবনাকে রুদ্ধ করে।

নীরব রাজনীতি- আশ্রয়, খাদ্য ও তথ্যের ভূমিকা

নুপি লানের ইতিহাস সাধারণত মিছিল, ঘেরাও ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের বর্ণনায় সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু আন্দোলনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে যে নীরব পরিকাঠামো প্রয়োজন ছিল- তা গড়ে উঠেছিল পাড়া, পরিবার ও প্রতিবেশী সম্পর্কের মাধ্যমে। এই ক্ষেত্রে মৈতৈ পাঙাল সমাজের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। লিলোং ও মিনুথোং অঞ্চলের বহু মৈতৈ পাঙাল পরিবার আন্দোলনকারীদের জন্য সাময়িক আশ্রয়, রাতের খাবার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করেন। মৌখিক ইতিহাস অনুযায়ী, বাজার বন্ধ থাকার সময়ে কিছু মৈতৈ পাঙাল পরিবার নিজেদের খাদ্য মজুত আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন।

এছাড়া প্রশাসনিক নজরদারি এড়াতে তথ্য আদান-প্রদানও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বাজার এলাকায় পুলিশের গতিবিধি সম্পর্কে খবর পেয়ে অনেক সময় আন্দোলনকারীরা আগেভাগে সতর্ক হতে পেরেছেন এই তথ্যের উৎস হিসেবে মৈতৈ পাঙাল যুবকদের ভূমিকার কথা স্থানীয় স্মৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

ধর্ম, পরিচয় ও শ্রেণি- নুপি লানের অন্তর্লীন যুক্তি

নুপি লান দেখিয়ে দেয় যে ঔপনিবেশিক শোষণের মুখে ধর্মীয় পরিচয়ের চেয়ে শ্রেণিগত বাস্তবতা অধিক কার্যকর হয়ে উঠতে পারে। মৈতৈ ও মৈতৈ পাঙাল সমাজ- উভয়ই বাজার, কৃষি ও শ্রমভিত্তিক অর্থনীতির অংশ হওয়ায় তাদের অভিজ্ঞতা একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এই আন্দোলনে ধর্ম কখনোই সংগঠনের ভিত্তি হয়ে ওঠেনি। বরং খাদ্য, মূল্য ও জীবিকার প্রশ্ন আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে ছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নুপি লানকে উপমহাদেশের বিরল 'অ-সাম্প্রদায়িক গণআন্দোলন' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

নুপি লান ও অন্যান্য নারী আন্দোলন

ভারতীয় উপমহাদেশের নারী আন্দোলনের ইতিহাসে নুপি লান একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ। স্বদেশি আন্দোলন, চা-বাগান শ্রমিক আন্দোলন বা তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ এসব ক্ষেত্রে নারীরা অংশ নিলেও নেতৃত্ব ও সংগঠন ছিল পুরুষকেন্দ্রিক। নুপি লানে নারীরাই ছিল আন্দোলনের মুখ্য শক্তি। এখানে মৈতৈ পাঙাল নারীদের ভূমিকা নুপি লানকে আরও স্বতন্ত্র করে তোলে। এটি দেখায় যে আন্দোলনটি কেবল লিঙ্গ-ভিত্তিক নয়, বরং শ্রেণি ও অর্থনীতি ভিত্তিক। ধর্মীয় বিভাজন এই আন্দোলনের কেন্দ্রে আসেনি যা উপমহাদেশীয় প্রেক্ষাপটে বিরল।

উপসংহার

নুপি লান একটি প্রমাণ যে, নারীরা ইতিহাসের কেবল ভুক্তভোগী নয়, বরং 'সক্রিয় নির্মাতা'। এই আন্দোলন দেখায় যে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে নারী নেতৃত্ব, সামাজিক সংগঠন ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা কতটা সমন্বয়পূর্ণভাবে কার্যকর হতে পারে। তাই মণিপুরের ইতিহাসে নুপি লান কেবল একটি অধ্যায় নয়; এটি একটি 'রাজনৈতিক চেতনার মোড় ঘোরানো মুহূর্ত'। নারীরা স্থানীয় অর্থনীতি, সামাজিক সংগঠন এবং বাজার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ব্যবহার করে গণতান্ত্রিক দাবিতে নেতৃত্ব দেন। তাদের সংগ্রাম তাৎক্ষণিকভাবে সব দাবির পূর্ণতা দিতে না পারলেও, এটি শাসনব্যবস্থার নৈতিক বৈধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পথ নির্দেশ করে। নুপি লানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, নারী নেতৃত্ব, সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং গণসংগঠন একত্রিত হলে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন আনতে পারে, যা স্থানীয় ইতিহাসে এবং উপমহাদেশীয় রাজনৈতিক চেতনায় চিরস্থায়ী প্রভাব ফেলে।

পাশাপাশি, মণিপুরের নুপি লানকে যদি কেবল মৈতৈ নারীদের বিদ্রোহ হিসেবে দেখা হয়, তবে তার রাজনৈতিক গভীরতা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মৈতৈ পাঙাল সমাজ, বিশেষত নারীরা- এই আন্দোলনের নীরব ভিত্তি নির্মাণ করেছিলেন। কৃষি, বাজার ও তাঁতশিল্পে তাদের শ্রম, খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা এবং তথ্য আদান-প্রদানের ভূমিকা ছাড়া নুপি লান দীর্ঘস্থায়ী হতে পারত না।

এই আন্দোলন দেখিয়ে দেয় যে ইতিহাস নির্মিত হয় শুধু দৃশ্যমান নেতৃত্ব দিয়ে নয়, বরং অসংখ্য অদৃশ্য শ্রম ও নৈতিক সাহস দিয়ে। মৈতৈ পাঙালনারীদের ভূমিকা সেই অদৃশ্য ইতিহাসেরই অংশ।

নুপি লান তাই কেবল মণিপুরের নারী আন্দোলনের ইতিহাস নয়; এটি বহুসাংস্কৃতিক সমাজে শ্রেণি-ভিত্তিক সংহতির এক বিরল দৃষ্টান্ত। ভবিষ্যৎ গবেষণায় এই দিকগুলো আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করা জরুরি।

প্রাথমিক ও কমিউনিটি আর্কাইভ উৎস

Singel Sana, R. K. ‘Women Movements in Colonial Manipur: The 1st Nupi Lan and the 2nd Nupi Lan.’ International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR), Vol. 7, Issue 4, July–August 2025.

E-Pao.net. ‘Nupi Lan – The Women’s War in Manipur, 1939 (Part 1).’ Accessed 2025. https://www.e-pao.net/epSubPageExtractor.asp?src=manipur.History_of_Manipur.Nupi_Lan.Nupi-lan_1939_1

E-Pao.net. ‘Nupi Lan – The Women’s War in Manipur, 1939 (Part 2).’ Accessed 2025. https://www.e-pao.net/epSubPageExtractor.asp?src=manipur.History_of_Manipur.Nupi_Lan.Nupi-lan_1939_2

E-Pao.net. ‘Nupi Lan: The Great Second Women Agitation of Manipur, 1939–40 (Part 1).’ Accessed 2025. https://www.e-pao.net/epSubPageExtractor.asp?src=manipur.History_of_Manipur. Nupi_Lan.Nupi_Lan_The_Great_Second_Women_Agitation_of_Manipur_1939-40_Part_1

E-Pao.net. ‘The Women’s War of 1904 (First Nupi Lan).’ Accessed 2025. https://www.e-pao.net/epSubPageExtractor.asp?src=manipur.History_of_Manipur.Nupi_Lan.The_Women_War_of_1904

E-Pao.net. ‘The Need for Another Nupi Lan.’ Accessed 2025. https://www.e-pao.net/epSubPageExtractor.asp?src=manipur.History_of_Manipur.

Nupi_Lan.The_need_for_another_Nupi_Lan_By_Free_Thinker

E-Pao.net. Nupi Lan Archive Index. Accessed 2025. https://e-pao.net/epSubPageSelector.asp?ch=manipur&src=Nupi_Lan

সংবাদপত্র ও সমসাময়িক বিশ্লেষণ

Imphal Times. 'Meitei Pangal Women's Role in 1939 Uprising Remains Unrecognized, Say Activists.' Accessed 2025. https://www.imphaltimes.com/news/meitei-pangal-womens-role-in-1939-uprising-remains-unrecognized-say-ummwdo/

Two Circles.net. 'Manipuri Muslim Women Remembered for Their Role in 1939 Nupi Lan.' Accessed 2025. https://twocircles.net/2014dec14/1418564759.html

Indian Express. 'Explained: Nupi Lan, the Women's War of Manipur.' Accessed 2025. https://indianexpress.com/article/explained/explained-history/nupi-lan-the-womens-war-manipur-10416604/

Wikipedia contributors. 'Nupi Lan.' Wikipedia, The Free Encyclopedia. Accessed 2025. https://en.wikipedia.org/wiki/Nupi_Lan

মৌখিক ইতিহাস (অপ্রকাশিত)

Oral history interviews and community memories collected from Lilong, Minuthong, and Mayang Imphal (family narratives, women's testimonies, and local chronicles, cited in e-pao.net essays and community records).

ওয়ানগালা উৎসব
বাংলাদেশের গারোদের চেতনার আকর

বাঁধন আরেং

ভূমিকা

অনুগ্রহর প্রাপ্তি স্বীকার করে কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের শুভদিন হিসাবে উৎসব উদযানের দিন 'ওয়ানগালা'। আদি পিতা-মাতাগণ বিশেষভাবে খেয়ে বেঁচে জীবন ধারণের জন্য জমিতে খাদ্যশষ্য চাষাবাদ করে। ফসল দেবতা সালজং-এর সহযোগিতায় ভাল ফসল লাভের আনন্দে কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য বিশেষভাবে এই দিনটি নির্বাচন করে। এই মঙ্গলকর দিনটি যুগে যুগে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিবস হিসাবে পালন করে আসছে। জুম চাষি গারোরা ধন্যবাদ জ্ঞাপনের দিবসটি সমারোহে পালন করে থাকে। মহতি এই দিনটিকে 'ওয়ানগালা' বলে পালন করা হয়ে থাকে। ওয়ানগালার অর্থ হল, পাতা বিছিয়ে তাতে প্রদান করা, উৎসর্গ করা, উপহার দেওয়া, উপচার দেওয়া বা সম্মান করে সম্মুখে নিবেদন করা। প্রদানকারী, দানকারী, অনুগ্রহ করে বিলিয়ে দেন যিনি সেই দেবতার প্রতি নিবেদন, উপস্থাপন, প্রদান করাকে 'ওয়ানগালা' হিসাবে অভিহিত করে আসছে। এর সংক্ষিপ্ত অর্থ হল, সম্মান ও ভক্তির সাথে দেবতাকে উপহার নিবেদন করা। A. G. Momin-এর A•chikni Ku•andik গ্রন্থে এভাবে লেখা আছে, পঞ্চমুখি কচু ও আদা জমি থেকে তোলা হয়ে গেলে দানকারী বিতরণকারী দেবতা *মিসি সালজং* যিনি বছর মাস ও সকল খতুতে দান করে বিলিয়ে দেয়, তাকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে তার কাছে আবার প্রার্থনা নিবেদন জানাই যেন তিনি আসছে বছর পরিমিত বৃষ্টি ও হলকা শিলা, মাস ও বছর জুরে মঙ্গল বর্ষণ করেন, তার জন্য ধূপারতি উৎসর্গ করে, বছরের জন্য কুয়াশাকে বৃষ্টিতে পরিণত করে, বরফ কণার পরিবর্তে ভাত ছিটিয়ে মঙ্গলজনক বছরের প্রত্যাশায় যে ধন্যবাদ উৎসব পালন করা হয় তাকে ওয়ানগালা বা ড্রু-ওয়ানগাল বলে আসছে যুগ যুগ ধরে (Momin, 2017:29)।

চিন্তার ক্ষেত্রসমূহ

প্রয়োজনমতো বৃষ্টিপাত, রোদের তাপ, বায়ুপ্রবাহ এসবই রক্ষাকারী দেবতার অনুগ্র এবং তার দান। পোকা-মাকড়, বিভিন্ন প্রকার বালায় দ্বারা ধান-কাউন, শাকসবজি, ভাঙ্গি, বেগুণ, চালকুমড়া, মিষ্টিকুমড়া, পঞ্চমুখি কচু, বরবতি ও শিম এভাবে আরও অনেক ফসল জুমে চাষকৃত ফসল নষ্ট হতে পারত। কিন্তু সালজং দেবতার অপার করুণা, ভালবাসায় মানুষের কঠোর পরিশ্রম, গায়ের ঘাম ঝরিয়ে চাষাবাদ করা ফসল সম্পদ সুরক্ষিত থেকে যায়। ভূমিতে থাকা চোখে দেখা, না দেখা কীট-পতঙ্গ অনিষ্ট করতে পারত। কিন্ত দেবতা মিসি সালজং সেসব অনিষ্টকারীদের হাত থেকে রক্ষা করে থাকেন।

শীত, গরম, তাপ, ভেজা সকল অবস্থা প্রয়োজনমতো মানুষ চাষের কাজে লাগিয়ে চাষাবাদ করে, দেবতা সুরক্ষা দিয়ে মানুষের জন্য খাদ্য দান করে। মানুষের জীবন-যাপনে সকল অবস্থারই প্রয়োজন। কোন কিছুকেই অস্বীকার বা প্রয়োজন নেই বলা যায় না। মানুষের চারপাশে বিদ্যমান সকল কিছু ছোট-বড়, চোখে দেখা না দেখা, সজীব, নির্জীব সব কিছুই কোনো না কোনো কারণে মানুষের কাজে বা পৃথিবীর কল্যাণের কাজে অনিবার্যভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ কারণেই কৃষিজীবিদের প্রত্যেকেই সতর্কতার সাথে যত্ন করে সকল কাজ করতে হয় যেন ফসলের সাথে সবাই সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ পেতে পারে।

পাতালপুরি থেকে ওয়ানগালা উৎসব উদযাপন শুরু হওয়ার গল্প প্রচলিত রয়েছে। দেওয়ান সিং এস. রংমুথু-এর সংকলিত পিতৃপুরুষদের কাহিনি (আ·চিক কাত্তা গিৎচাম-আচিক/গারোদের অতীত কাহিনি) গ্রন্থে ২৮৩-২৮৪ পৃষ্ঠায় "মানুষ (মান্দি) ওয়ানগালা কীভাবে পেল?" নামে একটি গল্প আছে। গল্পটি শুরু হয় এভাবে, "সাত স্তর, সাতালপুরির তলদেশে পটকা মাছ নিজের পেট দামা (ঢোল) বাজিয়ে, না·সুডেঙ্গা মাছ (গারো ভাষায় 'না·সুডেঙ্গা' এক প্রকার সিং মাছ, আকারে ছোট) নিজের মুখ বাঁশি করে বাজিয়ে, দারওয়াক আওয়াজ করে কর·তাল বাজিয়ে পক্কা রন্ডা (এক প্রকার ছোট প্রাণী, বাংলা নাম জানা নেই), ডাললিং জা·ওয়েক (পায়ে খাটো, ছোট আকারের পাখি বিশেষ), ঘুরে ঘুরে ঢুলে ঢুলে রাত-দিন-মাস-বছর পাতালজুরে সূর্য্যের মুখ না দেখে মাটির তলদেশ-পাতাল পুরিতে স্রুবালমা পানির গভীরে গিথুবালমা দাদি ওয়ারেকঙা, ওয়াজাওঙামিং অনবরতর নৃত্যরত গামচালটকঙামিং আপন খেয়ালে') (S. Rongmuthu, Dewansingh.1997:283), গল্পের শেষদিকে একটি কবিতার কয়েকটি লাইনে এভাবে বলা হয়েছে-

"লেবু পাতা হাত তুলে নাচন খেলে,
পেঁচানো লতা ঝুলে ঝুলে,
মিত্তংবল কেঁপে কেঁপে,
কাউন নাচে দোলে দোলে
সালজং দেবতা নাচে ডোলে ডোলে"

(S. Rongmuthu, Dewansingh.1997:284)

গল্পের শেষান্তে এভাবে বলা হয়েছে, "এটিই আজো পর্যন্ত নানা-নানি, দাদা-দাদি গ্রামের সবাই একমত পোষণ করে, আলোচনা করে, খুশীমনে অনুসরণ ও পালন করে আসছে। আর এটাকেই 'ওয়ানগালা' বলে (S. Rongmuthu, Dewansingh.1997: 284)"। গল্পে আরো অনেক কথাই বলা আছে, কিন্ত এই লেখায় সব কথা সম্পূর্ণ বলা হয় নি। কারণ ওয়ানগালা বিষয়ে বেশ কিছু গল্প প্রচলন আছ। ওয়ানগালার তাৎপর্য আর কীভাবে ওয়ানগালা শুরু হয়েছিল সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করাই এই লেখার উদ্দেশ্য। কারো যদি কৌতুহল হয় তাহলে উল্লেখিত গ্রন্থটি "Apasong Agana (A•chik Katta Gitcham- পূর্বপুরুষদের কথামালা (আ•চিক/গারোদের প্রাচীন কাহিনী)" পড়ে দেখতে পারেন।

নিজের পেট ঢোল বাজিয়ে, একসাথে নেচে-গেয়ে মনের আনন্দ প্রকাশের গল্প বলা হয়েছে। স্রষ্টার প্রশংসা ও ধন্যবাদ জানিয়ে প্রতিবছরই ওয়ানগালা উৎসব পালন করতে সবাই উৎসাহী হয়। পশুর চামড়া দিয়ে দামা (ঢোল) তৈরি করে সিঙ্গা ফু (সিঙ্গা ফু দিয়ে) দিয়ে মানুষ জড় করে পানাহার করে আনন্দ-ফূর্তিতে মদিরা পান ও মনের সুখে একত্র হয়ে সেইকালে মানুষ জীবন-যাপন করত। প্রথমদিকে কোনো মানুষ 'ওয়ানগালা' সম্পর্কে জানত না। জুম ভূমিতে চাষাবাদ করে জীবন-ধারণের বিষয়ও জানা ছিল না। জুম ভূমিতে কীভাবে চাষাবাদ করে জীবন-ধারণ করতে হয় সে সব বিষয়ে আলাদা আলাদা গল্প আছে। কীভাবে প্রথম ধানে বীজ পেয়েছিল, কে ধানের বীজ দিয়েছিল তারও গল্প আছে। জমিতে কীভাবে বীজ বপন বা রোপণ করতে হয় তারও আলাদা একটি গল্প রয়েছে। কাহিনি অনুযায়ী জানা যায় মানুষ ধান ও ভাত কীভাবে চিনতে পারে। এর আগে বনের আলু ও ফল খেয়ে মানুষ জীবন ধারণ করত বলে গল্পে বলা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ ভাবনার বিষয়সমূহ

এভাবেই চাষাবাদকে ভিত্তি করে দেবতা, মানুষ আর বন, ঝরনা-জলাশয় সম্পৃক্ত জীবনযাপনে নিবিড়তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জমি চাষকে ভিত্তি করে গারো জাতির

সংস্কৃতি ও পালনীয় উৎসবাদি শুরু হয়েছিল। ভালো উদাহরগুলো অনুসরণ করে সম্মান দেখিয়ে গ্রহণ ও ধারণ করার মতো অনেক বিষয় ওয়ানগালায় নিহিত রয়েছে। পরিবেশের চারপাশে অনেককিছু নিবিড়ভাবে যুক্ত রয়েছে যা পারস্পারিক স্বার্থের গুরুত্বপূর্ণ কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিদ্যমান বিষয়গুলো গল্পের মত মনে হলেও সূচনাপর্বের কাজ এভাবেই শুরু হয়েছিল। বাংলাদেশের গারোরা নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ভাবনা আর পূর্বপুরুষদের অনেক মৌলিক চিন্তা-ভাবনা, মূল বক্তব্য, অনুসরণীয় বিষয়গুলো নানা কারণে হারিয়ে যাচ্ছিল। ওয়ানগালা উৎসব উদযাপনের প্রাথমিক প্রয়াসে গারোদের ভাবনায় নিজেকে জানার আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। চারপাশের পরিবেশে পূর্বপুরুষদের ভাবনা ও জীবন-যাপনের ছায়ামূর্তি যেন প্রতীয়মান হয়। যেনবা তাদের সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবে দৃশ্যমান হয়। উপযুক্তভাবে চারপাশের পরিবেশ দেখাশোনা করে অন্তর-আত্মায় বিশ্বাস করে উদাহরণ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সবকিছুরই শুরুটা থাকে এবং প্রকৃতভাবেই সেটি গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। সে কারণেই সেটি ভুলে যাওয়া বা হারিয়ে ফেলা যায় না। জাতির ভাবমূর্তি উন্নত করার ক্ষেত্রে ‘ওয়ানগালা’ উৎসব উদযাপন যথাযথভাবে অনুসরণীয়, মহৎ কাজ এবং এটি বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে ভাবনা-চিন্তার একটি দিন। এই দিবসটি পালন করে ইদানীং বাংলাদেশের গারোদের মধ্যে বিশেষভাবে শুভচিন্তা পরিলক্ষিত হয় বলে ধারণা করা যায়। দেশে যে বাস্তবতাই বিদ্যমান থাকুক না কেন দেশের জন্য ভালো কিছু করার ভাবনা নিয়ে তরুণদের কাজ করতে লক্ষ্য করা যায়। নিজের ভাষায় লেখালেখি করার সযত্ন প্রয়াস চোখে পরে। অনেকেই বাংলা বর্ণমালা ব্যবহার করে নিজের ভাষায় লিখতে চেষ্টা করে। গারোভাষার বর্ণমালা আছে বিষয়টি আজো অনেকেই স্পষ্টভাবে জানে না। নিজের মতো করে ভাষা সংক্রান্ত অনেককেই কথা বলতে শোনা যায়। অবশ্যই চর্চা করতে হবে, জানা বিষয় পরস্পর আলোচনা করতে হবে তবে গভীরভাবে জেনে বুঝে কথা বলার বিষয়টি থেকে যায়। কারণ শুরুতে একাডেমিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি মান বা স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখতে হয়। বাংলাদেশের গারো শিশুদের অন্য ভাষা ব্যবহার করে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। একারণেই ভাব বিনিময় ও লেখার কাজে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অন্য ভাষা ব্যবহার করতে হয়। একাডেমি, চাকুরি, পারস্পরিক ভাববিনিময়, হাট-বাজারসহ সকল ক্ষেত্রে নিজের ভাষা ব্যবহারের সুযোগ কম থাকে। পরিবারে, ধর্মীয় উপাসনা যেমন, প্রার্থনা, বক্তব্য প্রদান, গ্রামে পারস্পারিক আলাপচারিতায় নিজের ভাষা ব্যবহার করা যেত। কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে নিজভাষা ব্যবহার হয় না। এভাবে নিজ জাতির অনেক সাংস্কৃতিক বিষয় হারিয়ে যেতে বসেছে।

বাংলাদেশ গারোদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কার্যক্রম

১৯৮০ সালের দিকে বাংলাদেশের গারোরা অতি চমৎকার দিবস 'ওয়নগালা' উৎসব উদযাপনের চিন্তাভাবনা করতে শুরু করে এবং এটি পুনরুজ্জীবিত করার চেতনায় দিবসটি পালন করতে শুরু করে। পূর্বপুরুষদের আদিধর্ম 'সাংসারেক' ত্যাগ করে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করার পর কয়েক যুগ নানা কারণে প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক রীতি-রেওয়াজ ভুলে যাচ্ছিল। বাংলাদেশ গারোদের গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোর মধ্যে থেকে ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক অনেক কিছু হারিয়ে যাচ্ছিল। বেশ কয়েকটির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভাষা একটি। সে বিষয়ে চিন্তা করা, আলোচনা করা, পারস্পরিক সহযোগিতা করা, অনুসরণীয় বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখা যাচ্ছিল। এই বাস্তবতাগুলো ওয়ানগালা উৎসব আয়োজন করতে গিয়ে অনুধাবন এবং সচেতনতা লাভ করা যায়। সুতরাং 'ওয়ানগালা' একটি মহৎ এবং আর্শীবাদিত উৎসব। দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় পরম স্রস্টার গুণগান, তাঁর দান, সহযোগিতা আর সুরক্ষা ও সকল কিছুতে তার কৃপা স্মরণ করে তাঁর প্রশংসা করা সত্যিই উচিত। নিজ ভাষায় কথা বলা, পোশাক-আশাক, খাদ্যাভ্যাস, পালনীয় দিবস, রীতি-রেওয়াজ, শিশুদের নামাকরণ এসবই পুনর্চেতনার ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। উৎসবের দিনে নিজ ভাষায় ভাববিনিময় হয়ে থাকে। নৃত্যগীত, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাদ্য-বাজনা এসবের মধ্যেই নিজস্ব সাংস্কৃতিক বিষয়-আসয় জানার সযত্ন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

নিজেকে জানা

বাংলাদেশের গারোরা নিজেদের জানার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে ধারণা করা যায়। বিশেষ করে নিজ সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্মান ও গর্ববোধ অত্যন্ত মর্যাদার বিষয়। অন্যরা যে যাই ধারণা করুক না কেন নিজ সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা বাংলাদেশের গারোদের বিশেষ একটি গুণ। ওয়ানগালা উৎসব উদযাপনে অনুগ্রহদানকারী, বিতরণকারী, দানকারীর উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার, সম্মান প্রদর্শন এবং প্রশংসা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন ছাড়াও মানুষের নিত্যনৈতিক জীবনের নানান বিষয় এই দিনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। রক্ত-মাংসের মানুষ হিসাবে পানাহার, নৃত্য-গীত, খেলা-ধুলা, বাদ্য-যন্ত্র, গান-বাজনা, সুদিনের গল্প-কাহিনি স্মরণ করে তরুণদের কাছে প্রকাশ করে জানানোর কাজ হয়। তরুণরা জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিভিন্ন প্রথা-রীতি, আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে ও শিখতে পারে। এভাবেই গারোদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির অনেক আচার-অনুষ্ঠান, উজ্জ্বল হয়ে টিকে আছে। নানার

বাধাবিপত্তি থাকা সত্ত্যেও অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রয়াসের কারণে বাংলাদেশের গারোরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমগ্র জাতি ও দেশের মঙ্গলের লক্ষ্যে অবদান রেখে চলেছে। এসব কিছুতেই প্রশংসা ও ধন্যবাদজ্ঞাপনের বিষয় সম্পর্কযুক্ত।

চাষাবাদে ভাবনার নিগূঢ়তা

জমিতে ফসল ও শাক-সবজি চাষাবাদের সাথে মানুষের জীব-যাপনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। প্রয়োজনমত খাওয়া-খাদ্য গ্রহণ ছাড়া মানুষ সুস্থ্য-সবল হয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। খাদ্য উপাদানগুলোতে শরীর, মন, আত্মা, রক্ত ও চিন্তাশক্তি উদ্রেককর অপরিহার্য্য শক্তির উপাদানসমূহ নিবিষ্ট থাকে। চাষাবাদ ছাড়াও বন-জঙ্গলের প্রকৃতিক ফল, আলু আর মূল থেকে প্রাপ্ত ঔষধি, পাতা, ফুল, সবজি, ডিকগি (বন হলুদ), মাটির গভীরে আর গাছে পেঁচিয়ে বেঁচে থাকা লতাসমূহ মানুষের জীবন-ধারণের ক্ষেত্রে অপরিহার্য্যভাবে মূল্যবান এক একটি উপাদন হয়ে আছে। এসমস্তের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে পুর্বপুরুষদের বিশেষভাবে জানা ছিল। কৃষিকাজে যেন ভাল ফলন হয় তার জন্য পরিমিত বৃষ্টির প্রয়োজন আছে। প্রাচীনকালে সেযুগের মানুষজন জলাভূমি, জলাশয়, জলাধার, নদী সবকিছুই ঠিকমত রক্ষণাবেক্ষণ করত। *গয়েরা দেবতা*কে গভীরভাবে সম্মান দেখিয়ে তারা পূজা-অর্চনা করত। কারণ, *গয়েরা দেবতা* বৃষ্টিবর্ষণ অথবা মেঘমালার দ্বারা ছায়া সৃষ্টি করতে পারে বলে তারা বিশ্বাস করত। পুর্বপুরুষরদের বিশ্বাসে যে সত্য ছিল তা স্মরণে রেখে ওয়ানগালার দিনে গারোরা প্রশসংসা ও সম্মানে স্বীকার করে। কৃষিকাজের বিনিময়ে প্রাপ্ত ফসল সংগ্রহের পর সেসব নিজেরা ভোগ করার আগে অনুগ্রহদানকারী, বিতরণকারী, প্রদানকারীকে উপাচার হিসাবে প্রদান করে, উৎসর্গ করার পর নিজেরা ভোগ করত। এটি গারোদের সংস্কৃতিতে সবচেয়ে বড় পালনীয় এবং অনুসরণীয় দিবস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

মৌলিক ও উৎসমুখ ভুলা যাবে না

এমন মঙ্গলজনক পালনীয় ও করণীয় বিষয়গুলি শিক্ষিত, নতুন যুগের গারোরা আরো ভালভাবে করার জন্য চেষ্টা করছে। নতুন ভাবনা গ্রহণ করে পূর্বপুরুষদের চিন্তা, জ্ঞান সময়োপযোগী ব্যবহারের দ্বারা ভাবনার ক্ষেত্র প্রসারিত করার প্রয়াস অব্যাহত রাখা হয় যেন অন্য জাতিগোষ্ঠীর সাথে সমান তালে পা ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস (পানাহার), রন্ধনশিল্প, সাহিত্য এসবের মধ্যেই জাতীয় ভাব-মূর্তি বা ছায়া ফুটে ওঠে বা উদ্ভাসিত হয়। যে

কারণে মৌলিক চিন্তার সূচনালগ্নে যে বিশ্বাস ও অনুসরণীয় বিষয়গুলো থাকে সে সবের উৎসমুখ ভুলে যাওয়া উচিত নয়। বিশ্বাস, অনুগত, মানা বা সম্মান, পারস্পারিক ভালবাসা, নির্ভরতা, সহযোগিতা, পরিবেশের সমস্ত কিছু যাদের জীবন আছে, জীবনহীন, চোখে দেখা, চোখে না দেখা, পানি, বাতাস এমন আরো কিছু আছে যেগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার বিষয়ে ওয়ানগালার দিনে স্মরণ করা হয়ে থাকে।

ভূমি ও গারোদের জীবনযাত্রা

গ্রামীণ জীবনে পারস্পরিক সহযোগিতা, শান্তিতে সহজ জীবন যাপন করা, কারো ভুল-ক্রুটি হলে সঠিক সমাধানে সহায়তা করা, কারো প্রতি পক্ষপাতি না হওয়া এমন সব বিষয় 'ওয়ানগালা' উদৎসব উদযাপনে সর্বোত্তমভাবে স্মরণে রাখা হয়। তরুণরা যেন দেখে শিখে, অনুসরণ করে ভভিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে তারা যাতে আরো ভালো কাজ করে যেতে পারে ওয়ানগালার দিনে এমন চিন্তাভাবনা, আলাপ-আলোচনা, শলা-পরামর্শ করা হয়ে থাকে। গরীব-অসহায়, ছোট-বড়, দুর্বল, দীন-দরিদ্র সবার সাথে মিলে-মিশে সহজভাবে জীবন-যাপন নিয়ে কথা বলা হয়ে থাকে। এটিই ওয়ানগালা উৎসব উদযাপনের সর্বোত্তম কতগুলো বিষয়ের অন্যতম একটি। এখানেই গারোদের বিশেষ ভাবনা এবং করণীয় বিষয়গুলো নিহিত থাকে। সামনের দিনগুলোর জন্য পরিকল্পনা করে ভূমির মালিক দেবতার কাছে পূজা-অর্চনার মাধ্যমে মঙ্গল যাচনা করে ওয়ানগালার দিনের কার্যক্রম শুরু করা হয়। চাষের জমি বা ভূমির সাথে গারোদের আত্মিক সম্পর্ক গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। ভূমি গারোদের কাছে শুধু মাত্র চাষাবাদ ও খাদ্য শষ্য উৎপাদন করার বিষয় নয় এটি তাদের কাছে পবিত্র এবং বিশ্বাসের একটি বিষয়ও।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে গারোদের কার্যক্রম

ভূমি, দেবতা, মানুষ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ বিষয় নিয়ে গারোদের একটি দর্শন ভাবনা হতে পারে। এই সব বিষয়ে পৃথক পৃথকভাবে ভাবা যেতে পারে কারণ অগণিত সমস্য বিদ্যমান রয়েছে। প্রতিদিনকার খাদ্য ও অনেক বিষয় নিয়ে নিবিড়ভাবে কাজ করার জন্য মানুষের প্রয়োজন আছে। কর্মক্ষেত্র প্রচুর আছে কিন্তু দক্ষতা পর্যায়ে কাজ করার মানুষের অভাব রয়েছে। যা-ই হোক না কেন ওয়ানগালাকে উপলক্ষ্য করে সম্প্রতি গারোরা সতর্কতার সাথে গুরুত্বসহকারে কাজ করে থাকে। এসব বিষয় পর্যালোচনা করে সম্প্রতি বাংলাদেশের গারোদের মধ্যে উন্নয়ন ঘটছে বলে প্রতিয়মান হয়। শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞানচর্চা, নিজস্ব ভাষাচর্চা, লেখা-লিখি, খেলা-ধুলা,

নিজস্ব রীতি-নীতি নিয়ে ভাবনা চিন্তা, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, সরকারি চাকুরি, এনজিও, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এভাবে আরো অনেক পেশাদার প্রতিষ্ঠানে ভালো ভালো পদে আসিন থেকে দায়িত্ব পালন ও কর্মরত লক্ষ্য করা যায়। সমাজের জন্য মঙ্গলকর এবং সন্তানদের আরো উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মহিলারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে কাজ করে যাচ্ছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষিতরা পুলিশ, সেনা, নৌবাহিনীতে যোগ দিয়ে দেশ সেবায় নিয়োজিত হচ্ছে। জাতীয় পর্যায়ের লেখাধুলায় গারো মেয়েরা জাতি এবং দেশের জন্য সম্মান ও গৌরব বয়ে আনার ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছে।

উপসংহার

খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণের পর বেশ কিছু দশক বাংলাদেশের গারোরা নিজস্ব সংস্কৃতি অনেক কারণে ভুলে যাচ্ছিল- কোনো কোনো ক্ষেত্রে অস্বীকার করার মতো অবস্থা হয়ে যাচ্ছিল। ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার কারণে অবহেলা দেখা যাচ্ছিল। শিক্ষিতদের চেতনায় ভিন্ন ভাবনা দেখা যাচ্ছিল। অন্যদের সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় প্রাধান্য লাভ করছিল। নিজ ভাষায় কথা বলা কমে আসছিল। তরুণ প্রজন্ম কোনোভাবেই নিজ সংস্কৃতি বুঝতে পারছিল না। ধর্মীয় সেবাদানকারিগণ অন্য ভাষা ব্যবহারে ঝোঁকে পড়ছিল। এমন বাস্তবতায় বাংলাদেশের গারোদের নিজ সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, সমাজ নেতৃত্ব, খাদ্যাভ্যাস, রন্ধন প্রক্রিয়াসহ আরো অনেক মূল্যবান রীতি-রেওয়াজ হারিয়ে যেতে বসেছিল। ওয়ানগালা পুনরুজ্জীবিত করার প্রতিদানস্বরুপ গারোদের মধ্যে ভরসা জাগানিয়া পাহাড়ের পাদদেশ, ঝরনার দু'ধারে, নদীর উভয় তীর থেকে সবুজে ঢাকা পল্লী আর নগর, মহানগরে জীবন ফিরে পাওয়ার মূল মন্ত্রবাণী হিসেবে ওয়ানগালাকে উল্লেখ করতে ইচ্ছে করে। এ কারণেই ওয়ানগালাকে বাংলাদেশের গারোদের জন্য একটি রেনেসাঁ হিসাবে হয়তো ধরে নেয়া যেতে পারে। নতুন চিন্তায় জীবন যাপনের ভরষা জাগানিয়া গৌরবময় একটি শব্দ হিসাবে 'ওয়ানগালা'কে চিহ্নিত করা যায়। ওয়ানগালাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য যারা গভীরভাবে চিন্তা ও বিশ্লেষণ করেছিলেন তাঁদের সবাইকে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদার সাথে স্মরণ করে ধন্যবাদ জানাই। বাংলাদেশের গারোরা নিজেদের জানার চেষ্টা করছে, এটি একটি উত্তম বিষয়।

তথ্যসূত্র

01। A. G. Momin; 2017. A•CHIKNI KU•ANDIK. Tura, Meghalaya: D. J. Publication, India.

02। S. Rongmuthu, Dewansingh. 1997. APASONG AGANA (A•chik Katta Gitcham). Romil Publishers (P.) Ltd. Delhi, India.

০৩। গারো ভাষায় লেখা প্রবন্ধটি বাংলায় অনুবাদের ক্ষেত্রে ব্যক্তি পর্যায়ে যাদের তথ্য সহযোগিতায় কাজটি সহজ হয়েছে, তাঁরা হলেন; মি. ব্রতিন কুমার ম্রং, মি. লেবিসন স্কু, মি. লিয়াং রিছিল ও মি. মিঠুন রাকসাম।

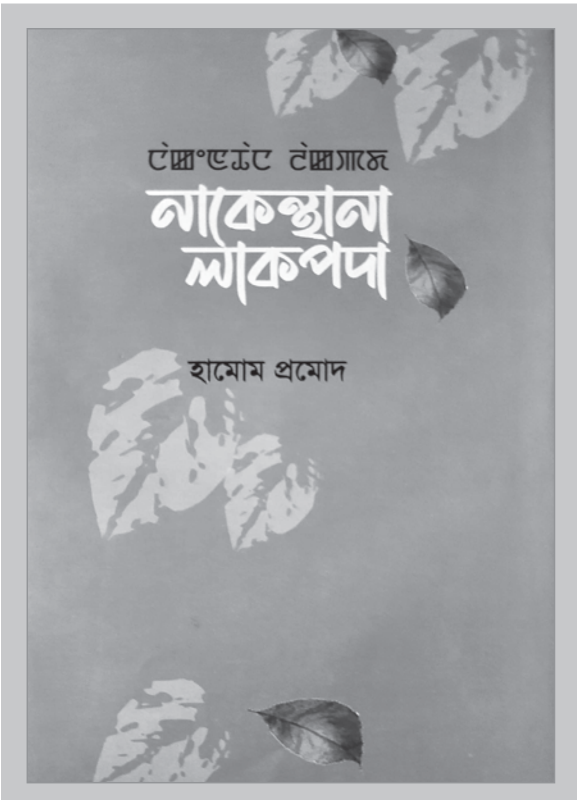

সবুজ অরণ্যে মহাপুরম জন্মভূমি সন্তান
চিত্ত কিশোর চাকমা

ইন্টু মনি তালুকদার

এক আদর্শ পিতা। তিনি জন্ম না হলে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম আলোকিত হতো না। তিনি হলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের চার ভাইবোন শ্রীমতি জ্যোতি প্রভা লারমা, শ্রী শুভেন্দু প্রবাস লারমা (তুফান) শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (মঞ্জু) শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধি প্রিয় লারমা (সন্তু) বিপ্লবী মহান নেতার বাবা শ্রী চিত্ত কিশোর চাকমা (যিনি চিত্ত কিশোর লারমা নামেও পরিচিত)।

মহান শিক্ষাগুরু, সুযোগ্য পিতা, দেশপ্রেমিক, মানবতাবাদী শ্রী চিত্ত কিশোর চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামের আলোর দিশারী। শ্রী চিত্ত কিশোর চাকমা ১২ ডিসেম্বর ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের নান্যাচরের ছোট মহাপ্রুম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম চানমনি চাকমা, মাতা নাম সুন্দরপুদি (সুন্দরবি) চাকমা সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। খাগড়াছড়ি খবংপয্যা গ্রামের বাসিন্দা রমেশ চন্দ্র দেওয়ানের জ্যেষ্ঠ কন্যা সুভাষিণী দেওয়ানের সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি ১৯৩০ সালে মহামুনি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পাশ করেন। চট্টগ্রাম কলেজে আইএ দ্বিতীয় বর্ষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করলেও তাঁর পক্ষে পারিবারিক কারণে ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়নি।

১৯৩৩ সালের তিনি মহাপ্রুম এমই স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। চাকুরিরত অবস্থায় তিনি বহরমপুর টিচার্স কলেজ থেকে Vernacular ট্রেনিং গ্রহণ করেন। অসচ্ছল সুবিধা বঞ্চিত ছাত্রদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে স্কুলের পাশেই বোর্ডিং (ছাত্রাবাস) চালু করেন। সবকিছু তিনি নিজে পড়াতেন এবং তদারকি করতেন। সেইসব ছাত্ররা সমাজের স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত এবং বিভিন্ন পর্যায়ের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। প্রগতিশীল ও সৃষ্টিশীল চিন্তা-চেতনার অধিকারী ছিলেন এবং নিরবে সাহিত্যচর্চা করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির যে দলীয় সঙ্গীত *নববর্ষের আছি এ পুণ্য লগনে/নিঃস্ব জগতে মহাজীবনের*

চিত্ত কিশোর চাকমা

বোধনে/জাতীয় জীবনে জাগো হে/জুম্ম জাতি জাগো(২) গাও হবে জীবনের জয়গান...' সেটি তাঁর কালজয়ী এক রচনা। তিনি চাকমা জাতির ইতিহাস ও ভাষা সম্পর্কে লিখেছেন তাঁর ১৯৯৯ সালের প্রকাশিত গ্রন্থ চাকমা জাতির জীবন স্মৃতি। যেখানে মহাপুরম গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও চাকমা জনপদের জীবন চিত্র তুলে ধরেছেন। নিজ জন্মভূমি মহাপুরম গ্রামের চারপাশে নদনদী গিরিবন ও নিসর্গ সুন্দরের বর্ণনা। এছাড়াও তার অসংখ্য অপ্রকাশিত কবিতা ও গান রয়েছে। তিনি ছিলেন কবি ও সাহিত্যানুরাগী। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন বিভিন্ন প্রতিভার অধিকারী। শরীরচর্চা শিক্ষক ও ক্রিড়া সংগঠক হিসেবেও তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তিনি একজন আদর্শ শিক্ষাবিদ হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের পশ্চাৎপদ জুম্ম সমাজে শিক্ষা বিস্তারে অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন। তাঁর উদ্যোগে ও নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম শিক্ষক সমিতি গঠিত হয়।

ছাত্র জীবন থেকেই তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন এবং মাস্টার দা সূর্য সেনের সহযোদ্ধা ছিলেন। জুম্ম জাতীয় চেতনা উন্মেষ, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আন্দোলন গড়ে তোলা, জনসংহতি সমিতি গঠন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তিনি ছোটবেলা থেকে ধর্ম পরায়ন ছিলেন। তিনি ১৯৬৯ সালে চাকমা রাজ বিহারে শ্রীমৎ ধর্মপ্রিয় নামে উপসম্পদা গ্রহণ করেন। তিনি আমৃত্যু শীলবান ধুতাঙ্গধারী ভিক্ষু ছিলেন। তিনি মহাস্থবির হয়ে ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

সালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যু সময় তার ছোট ছেলে জ্যোতিরিন্দ্র বোধি প্রিয় লারমা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার গ্রহণে তার সফরসঙ্গী হিসেবে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ছিলেন। অথচ তিনি সমাজের জন্য, জাতির জন্য কত কী করেছেন। কত ছাত্রের জীবনের তিনি শিক্ষা আলো জ্বালিয়ে ছিলেন। জুম্ম জাতির মহান দুই নেতা প্রয়াত এম এন লারমা ও সন্তু লারমার সংগ্রামী চেতনা ও প্রগতিশীল নীতি-আদর্শের ভিত গড়ে উঠেছিল তাঁরই শিক্ষা ও নির্দেশনায়।

২০০০ সালের মে মাসে দৈনিক *প্রথম আলো*তে প্রকাশিত এক সাক্ষাতকারে তাঁর পিতা সম্পর্কে শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধি প্রিয় লারমা বলেন, "বাবা (চিত্ত কিশোর চাকমা) স্থানীয় জুনিয়র হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তবে শুধু একজন শিক্ষকই নন, তিনি একাধারে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও একজন রাজনীতিবিদ আর অন্যদিকে তিনি একজন সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ ছিলেন। আদর্শ পিতা হিসেবে আমার দৃষ্টিতে তিনি অতুলনীয়। তিনি শিল্পী মনেরও অধিকারী ছিলেন। সকল ধর্মের প্রতি তিনি পরম সহিষ্ণু ছিলেন। তিনি মানবতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। বাবা জীবন-দর্শন আমার সমগ্র জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বাবার হাতেই আমার রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি। বাবা ছিলেন আমার জন্মদাতা, শিক্ষাগুরু, পারিবারিক ও ব্যক্তিজীবনে বন্ধু, বিপ্লবী জীবনে পরম উপদেষ্টা।" সেই মহান ব্যক্তিকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।

সূত্র

১. *চাকমা জাতির জীবন স্মৃতি*, লেখক চিত্ত কিশোর চাকমা

২. *বৈচিত্র্য রাঙামাটি*, লেখক ড. জাফর আহমেদ, জেলা প্রশাসক, রাঙামাটি

৩. *শ্রী আশাপূর্ণ চাকমা (নৈতিক) স্মরণিকা* পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, ১০ নভেম্বর স্মরণে।

চাকমা নৃগোষ্ঠীঃ সুলুক সন্ধানে

তৌফিকুল ইসলাম চৌধুরী

বাংলাদেশে বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে 'চাকমা' বা 'চাঙমা' সমাজ নানাকারণে বিশিষ্টতার দাবিদার। সাহিত্য-শিল্পকলা-শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অগ্রগামী এ জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের আদিবাসী নৃগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠও বটে। বাংলাদেশে প্রধানত পাহাড়ি চাদর আবৃত পার্বত্য চট্টগ্রামেই তাদের মূল আবাস। এছাড়াও উত্তর-পূর্ব ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরামের দক্ষিণাংশে, আসাম, অরুণাচল (নেফা), মিকির হিলসেও চাকমারা বাস করে। ভারতের মিজোরামে 'চাকমা অটোনোমাস ডিস্ট্রিক কাউন্সিল' নামে একটি এলাকাও আছে। মায়ানমারের আরাকানে, বাংলাদেশের কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফে 'দৈংতাক' নামে চাকমাদের আরও একটি শাখা বসবাস করে, যারা সেখানে বাংলাদেশি চাকমাদের মতো নিজেদের 'চাঙমা' বলে। অনুসন্ধানে দেখা যায়, চাকমাদের মধ্যে তিন শতাধিক টোটেমভিত্তিক 'MS'(বংশ) এবং দেড় শতের মতো 'গোত্থি' (পরিবারভিত্তিক শাখা) রয়েছে।

চাকমারা নিজেদের 'চাঙমা' বলে অভিহিত করলেও 'চাংমা' শব্দটির উৎস আজো অনুদঘাটিত। বর্মী ভাষায় 'চাক'>'চেক' অর্থ 'শাক্য', ম্যাং অর্থ রাজা। এই হিসেবে 'চাকম্যাং' অর্থ 'শাক্য রাজ বংশীয়'। চাকমা রাজা ভূবন মোহন রায় মনে করেন, "চাকমারা শাক্য রাজ বংশজাত মহামুনি বুদ্ধের বংশধর"। (চাকমা রাজবংশের ইতিহাস-ভূবন মোহন রায়। ১৯১৯ ইংরেজি, পৃষ্ঠা-৩৭)। হয়তো 'চাকম্যাং' থেকেই চাকমা শব্দটি এসেছে। বাস্তবে দেখা যায়, চাকমারা জীবনাচারে প্রকৃতি পূজারী হলেও তারা মূলত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তারা বিশ্বাসে 'মা বসুমতী'কে স্বর্গের চিরন্তন পিতা 'চুইংগুলাং' এবং প্রকৃতি দেবী 'রমেশ্বরী' উৎপাদনজাত মনে করলেও বৌদ্ধ ধর্মের সাথে তাদের নৈকট্য অতীতেও ছিল। বাংলাদেশের চট্রগ্রামের আলী কদমের কাছে মাতামুহুরী নদীতে প্রাপ্ত চাকমা বর্ণখচিত প্রাচীন বৌদ্ধমূর্তিই

প্রমাণ করে দূর অতীতেও তারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল। রাজা ভূবন মোহন রায়ের দাবি অনুযায়ী তারা 'চাকম্যাং' শাক্য রাজবংশীয় হতেই পারেন। আবার অনেকে মনে করেন, রাজা বিজয়গিরি ৭ চমুঃ সৈন্য নিয়ে চট্টগ্রাম- আরাকান জয়ের স্মারক সংস্কৃত 'চমুঃ' থেকে 'চাম্মুয়া' (বাঙালিরা চাকমাদের 'চাম্মুয়া' বলে থাকেন) বা 'চাঙমা' শব্দটি এসেছে। আবার কেউ কেউ এও মনে করেন, চম্পকনগরের 'চম্পক' থেকে চাঙমা নামটির উদ্ভব।

বাংলাদেশে চাকমারা কখন, কোথা থেকে এসেছে বা এদের উৎস স্থল কোথায়- সে প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই এসে যায়। কর্ণেল ফেইরির ধারণা, চাকমাদের আদি নিবাস বার্মা বা মায়ানমারে। (The History of Burma-Colonel Phayer, page-37)। আরাকানি কাহিনি গ্রন্থ 'দেঙ্গ্যাওয়ার্দি আরেদফং' এ চাকমা বিষয়ে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়, ৪৮০ মগী সনে (১১১৮-১৯ সাল) একটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার প্রসঙ্গক্রমে। এতে বলা হয়, "এ সময়ে পেগো (আধুনিক পেগু) দেশে আলং চিছু নামে জনৈক রাজা ছিলেন। পশ্চিমের বাঙালিদের সাথে মিলে চাকমাগণ, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে"। (উদ্বৃতি- আরাকানের ইতিহাস গ্রন্থ- 'দেঙ্গ্যাওয়ার্দী আরেদফং', পৃষ্ঠা-১৭)। তিব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারানাথের একটি বক্তব্য থেকে মনে হয়, ১১৯৭ সালের দিকেও এতদঞ্চলে চাকমাদের বসবাস ছিল। লামা তারানাথ বলেন, মুসলিমদের মগধ (বিহার) বিজয়ের প্রাক্কালে বহু সংখ্যক বৌদ্ধ ভিক্ষু কুকি-ভূবনমিতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ঐ সময় রাজা বালাসুন্দ্রের পুত্রদের মধ্যে অতীতবাহন 'কমা'র রাজা ছিলেন। (Contemporary Buddhism in Bengal & Tripura. Vol-04, No-3 & 4-Heing Bechert, 1967) । ইশ্বর প্রসাদের উক্তি থেকে জানা যায়, তুর্কিদের বিহার বিজয়ের ঘটনা ঘটে প্রায় ১১৯৭ সালের দিকে। (A Short History of the Muslim Rule in India- Ishwar Prasad, Allahabad, India 1970)। এটা কারো অজানা নয় যে, আরাকানসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম সুদূর অতীতে কিরাত ভূমি এবং পরবর্তীকালে 'কুকিল্যান্ড' বা কুকিভূমি নামে পরিচিত ছিল। এখানে CHACOMAS বা 'চাকমা'র রাজা ছিলেন অতীতবাহন। পর্তুগিজ নাবিক Zoa De Borrows ১৫৫০ সালে কর্ণফুলি নদীর পূর্ব অববাহিকায় 'চাকমাস' নামে একটি এলাকা চিহ্নিত করেন, যেখানে অনেক আগে থেকেই চাকমাদের বসবাস ছিল বলে অনেকে মনে করেন। বিরাজ মোহন দেওয়ান 'চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের-২৯২ পৃষ্ঠায়, ১৪১৮ সালে চাকমাদের বাঙ্গালা দেশে প্রবেশের কথা জানান। (চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত- বিরাজ মোহন দেওয়ান, সরোজ আর্ট প্রেস, রাঙ্গামাটি, বাংলাদেশ, পৃষ্টা-২৯২, ১৯৬৯ সাল)। ধারণা করা

হয়, চর্তুদশ শতাব্দীতে চাকমারা 'লায়েট মিও' এর পশ্চিমে মধ্য-আরাকানের পাহাড়ি এলাকায়ও বসবাস করতেন। ১৭৮৭ সালের ২৪জুন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চট্টগ্রাম প্রতিনিধির কাছে ব্রহ্মরাজের লেখা একটি চিঠি থেকে মনে হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কিছু সংখ্যক চাকমা মায়ানমারের আরাকান থেকে পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিল। চিঠিতে বলা হয়, 'চূকমা (চাকমা), কিওকোপলাইস (লুসাই), মরিঙ (মুরং), মগ (মারমা) এবং আরাকানের অন্য অধিবাসীরা পালিয়ে গিয়ে আপনার সীমান্তের নিকটবর্তী পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে এবং...। Prof. Pierre Bessaignet's তার Tribesmen of Chittagong Hill Tracts গ্রন্থে জানান, "চাকমারা মঙ্গোলীয় জাতির সম্ভবত আরাকানী গোত্র থেকে উদ্ভুত- যদিও বহু বাঙালির সাথে তাদের অসবর্ণ বিয়ে হয়েছে"। (পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি-মূল-প্রফেসর পিয়েরে বেসেইনে। অনুবাদ- অধ্যাপিকা সুফিয়া খানম। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, বাংলাদেশ। পুনর্মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-০৯। পাদটিকা-০৭)। Burma National Ideolog গ্রন্থের চতুর্থ পৃষ্ঠায় মায়ানমারের মোট ১৮টি জাতিগোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করা হয়, এতে ০২ নং ক্রমিকে চাকমা'র কথা বলা হয়েছে, যারা ধর্মে বৌদ্ধ এবং মায়ানমারের পশ্চিমাংশে বসবাস করে। এ ধরনের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত থেকে মনে হয়, চাকমারা মিয়ানমার বা আরাকানি বংশোদ্ভুত।

'চাকমা পরিচিতি' গ্রন্থে সুগত চাকমা কিন্তু ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি জানান, "অনেক লেখক চাকমা রাজ্যের সন্নিকটে আরাকানের অবস্থান, চাকমা বর্ণের সাথে আরাকানি বর্ণের সাদৃশ্য, উভয় অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ইত্যাদি লক্ষ্য করে চাকমাদের বর্মী অথবা আরাকানি বংশোদ্ভুত বলে মনে করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, চাকমাদের বর্ণমালা দক্ষিণের আরাকানি বর্ণমালার সাথে নয়, বরঞ্চ উত্তরের অহোমদের পুরাতন বর্ণমালার সাথে একই পরিবারভুক্ত। আর চাকমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, পূজা-পার্বণ, উৎসব, পোশাক-পরিচ্ছেদ, রীতিনীতি ইত্যাদির সাথে বর্মী ও আরাকানিদের এত বেশি অমিল যে, চাকমারা কোনো অবস্থাতেই বর্মি ও আরাকানি বংশোদ্ভুত হতে পারে না; বরঞ্চ ঐগুলির সাথে আসাম ও ত্রিপুরার বিভিন্ন উপজাতীয়দের সংস্কৃতির মিল দেখা যায়। এ থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, চাকমারা আসাম-ত্রিপুরার দিক থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছিল"। (চাকমা পরিচিতি, সুগত চাকমা, বরগাঙ পাবলিকেশন্স, রাঙামাটি, বাংলাদেশ, ১৯৮৩ ইং, পৃষ্ঠা-০২)। তবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক, প্রাবন্ধিক, প্রশান্ত ত্রিপুরা তার

'পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস-অনুসন্ধান বিষয়ে' প্রবন্ধে আরাকান ও ত্রিপুরা, উভয়ের সাথে চাকমাদের সম্পর্ক খুঁজেছেন। তিনি মনে করেন, "চাকমাদের ক্ষেত্রেও নিকট অতীতে আরাকানের সাথে এবং সুদূর অতীতে হয়তো ত্রিপুরা রাজ্যের সাথেও সম্পর্ক ছিল"। (বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীঃ অংশীদারিত্বের নতুন দিগন্ত। সম্পাদনা- হাফিজ রশিদ খান। প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর ১৯৯৩ ইং, পৃষ্ঠা-১৮)। তবে চাকমারা মনে করেন, তাদের আদি নিবাস চেইন প্যেংগো বা চম্পকনগর।

চম্পকনগর কোথায় অবস্থিত- সে ব্যাপারে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারত, মায়ানমার ও দক্ষিণ এশিয়ার বেশ কয়েকটি জায়গায় 'চাম্পা' নামে এলাকার সন্ধান পাওয়া যায়। মনে করা হয়, 'চাম্পা' থেকে 'চম্পকনগর' কথাটি এসেছে। ভারতের হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহারের ভগলপুর ও পুনিয়া, মায়ানমারের আরাকানে, ভিয়েতনামে 'চাম্পা' এবং ত্রিপুরা রাজ্যে 'চাম্পা' ও 'চম্পকনগর' এলাকার সন্ধান পাওয়া যায়। চীনা পর্যটক ফা-হিয়েনের (৪২৯ ইং) বর্ণনায় জানা যায়, চম্পনগর ছিল তখনকার ভাগলপুরের কর্ণপুর রাজ্যের রাজধানী। চম্পকনগর বিষয়ে চাকমা ভাষার অন্যতম কবি ও গবেষক সুহৃদ চাকমা বলেন, 'চাকমাদের আদি বাসস্থান চম্পকনগর। এ বিতর্কিত চম্পনগর ভারতবর্ষ না কম্বোডিয়া, না শ্যাম- তাও এখনো প্রচুর গবেষণার অধীন। তবে চাকমারা তাদের সেই প্রিয় মাতৃভূমি এখনো স্মৃতির স্বর্ণজালে জড়িয়ে রেখেছে।' (প্রবন্ধ- চাকমা সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, সুহৃদ চাকমা। পুনঃপ্রকাশে শহীদ ইকবাল সম্পাদিত সাহিত্যপত্র 'চিহ্ন')।

"পার্বত্য সাহিত্য' সংখ্যা- জুন ২০২৬, রাজশাহী, পৃষ্ঠা-১১৩)। চাকমা সমাজে একটি লোকগীতি খুবই জনপ্রিয়। এতে চম্পকনগর নয়, নূরনগরের উল্লেখ আছে, যা পার্বত্য ত্রিপুরায় অবস্থিত। লোকগীতিটি নিম্নরূপ-'ডোমে বাজায় ঢোল-দগর/ ফিরে যাইয়ুম নূর নগর"।

চাকমাদের উৎসে ফেরার এই যে আকুতি, তা জানিয়ে দেয়- নূরনগর পরগণা তথা ত্রিপুরার সাথে তাদের একটা প্রাচীন যোগসূত্র রয়েছে। অনেকে মনে করেন, ত্রিপুরা রাজ্যের নূরনগরই কিংবদন্তির চম্পকনগর। 'চাকমা জাতি' গ্রন্থের লেখক সতীষ চন্দ্র ঘোষ তা-ই মনে করেন। (চাকমাজাতি-সতীষ চন্দ্র ঘোষ। কলিকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলি, ১৯০৯ ইং, পৃষ্ঠা-১১)। তবে Tribesmen of Chittagong Hill Tracts গ্রন্থে প্রফেসর পিয়েরে বেসেইনে (Prof. Pierre Bassaignet) 'চাকমা রাজপরিবারের ইতিহাস' অংশে রাজা ভূবন মোহন রায়ের যে

লেখাটি হুবহু তুলে ধরেছেন, তাতে দেখা যায়- চম্পকনগরের অবস্থান ইরাবতী নদীর পূর্বতীরে। এতে বলা হয়, হিমালয়ের পাদদেশে কালাপা- নগরকেন্দ্রিক ‘শাক্য’ চাকমা রাজবংশীয় রাজা সুদ্রজিৎ মৃত্যুমুখে পতিত হলে তার যুবক ছেলে সমুদ্রজিৎ রাজা হন। তিনি মন্ত্রী শ্যামলের সহায়তায় কিছু সময় রাজত্ব করলেও মাত্র ২০ (কুড়ি) বছর বয়সে ইশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হয়ে রঙ্গীন পৈতা পরে ভিক্ষু বনে যান। ফলে তার সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। তখন মন্ত্রী শ্যামল কালাপানগর পরিত্যাগ করে হিমালয়ের দক্ষিণ-পূর্বপার্শ্বে একটি নতুন সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। তার ছিল একপুত্র, নাম চম্পাকলি। চম্পাকলি ইরাবতি নদীর পূর্ব তীরে একটি নতুন নগর গড়ে তুলেন। তার নামানুসারে এর নাম রাখা হল ‘চম্পকনগর’। (পার্বত্য চট্রগ্রামের উপজাতি-মূল- প্রফেসর পিয়েরে বেসেইনে। অনুবাদ- অধ্যাপক সুফিয়া খান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, বাংলাদেশ। পুনর্মুদ্রণ-ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ ইং, পৃষ্ঠা-১১২)।

চাকমা ইতিহাস পাঠে জানা যায়, উচ্চ ব্রহ্মের (মায়ানমার) চাকমা রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেলে কুমার সূর্যজিত (চজুং) উচ্চ ব্রহ্মোং ‘মংজাম্রু’ নামে রাজধানী কেন্দ্রিক এক নয়া রাজ্যের পত্তন করেন। সূর্যজিত-এর মৃত্যুর পর তার ভাইপো মইসাং (১৪১২-১৪১৮) রাজা হন। তিনি ‘কর’ দিতে না পেরে বৌদ্ধ ভিক্ষুর পথ ধরেন। তার রাজত্বকালে ‘মংজাম্রু’তে রাজা মইসাং এর প্রজাকল্যাণে নির্লিপ্ততা ও মগদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ চাকমারা নিজেদের পূর্বপুরুষের পূণ্যভূমি চম্পকনগর ফিরে যেতে আকুল হয়ে উঠে। নিচের চাকমা লোকগীতিতে তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়:

“এল মইসাং লালস নেই, ন এলে মইসাং কেলশ নেই, /
চল বাপ ভেই চল যেই, চম্পক নগরৎ ফিরি যেই। /
ঘরত গেলে মগে পায়,ঝারত গেলে বাঘে পায়, /
মগে ন পেলে বাঘে পায়,বাঘে ন পেলে মগে পায়”। /

অর্থাৎ ঘরে ও জঙ্গলে মগ ও বাঘের ভয়। মইসাং রাজার ব্যাপারেও কোনো আশা-ভরসা বা আগ্রহ নেই। তাই বাপ-ভাই সবাই চল চম্পকনগর ফিরে যাই।

জনশ্রুতি আছে, আদিতে চেইনপ্যেংগো বা চম্পকনগরে এক রাজা ছিলেন। তার নাম ছিল সাংবুদ্ধা। তার ছিল দুই ছেলে- বিজয়গিরি ও সমরগিরি। বড় ছেলে বিজয়গিরি একদিন (সম্ভবত ৫৯০ খ্রিষ্টাব্দে) রাজার অনুমতি নিয়ে সেনাপতি রামাধনসহ ৭ (সাত) চমু (এক চমু = ২৬,০০০ জন) সৈন্য-সামন্ত নিয়ে দক্ষিণে যাত্রা করেন এবং কাঞ্চননগর, আরাকান (অন্ধ্রদেশ), সাপ্রেকুল জয় করেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষে স্বদেশে ফেরার পথে তিনি জানতে পারেন যে, এরই মধ্যে তার বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু হয়েছে এবং ছোটভাই সমরগিরি চম্পকনগরের সিংহাসন দখল করে

নিয়েছেন। তখন তিনি মনের দুঃখে আর স্বদেশে ফিরলেন না। সাপ্রেকুলে থেকেই রাজত্ব করতে লাগলেন। সাপ্রেকূলে তিনি এক উচ্চ বংশীয় রমণীকে বিয়ে করেন এবং তার অনুগত সৈন্যদেরও স্থানীয় মেয়েদের বিয়ে করতে অনুমতি দেন। এভাবে সাপ্রেকূলে বিজয়গিরি বংশের চাকমাদের বিস্তৃতি ঘটে।

'সাপ্রেকূল' কোথায় অবস্থিত তা আজো অনুদঘাটিত। বলা হয়ে থাকে, 'সাপ্রেই' শব্দটি মঘী, সাঃ অর্থ চাকমা, প্রেই অর্থ দেশ। (চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার-২য় খণ্ড- অশোক কুমার দেওয়ান)। বিরাজ মোহন দেওয়ান 'চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে ১৪১৮ সালে চাকমাদের বাংলাদেশে আগমনের কথা জানান। (চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত- বিরাজ মোহন দেওয়ান। রাঙ্গামাটি, বাংলাদেশ। পৃষ্ঠা-২৯২)। এছাড়া ইতিহাস বলে, "১৫৪৬ সালে একজন চাকমা রাজা উত্তর দিক থেকে গিয়ে তৎকালীন আরাকানের অধীন কক্সবাজারের প্যাঁওয়া (রামু) দখল করেন"। (স্যার এ.পি.ফেইরি-১৮৮৩:৭৯-উদ্ধৃতি)। আজও রামু বাজার থেকে কক্সবাজার যাওয়ার পথে রামুর দুই মাইল দূরবর্তী বাকখালী নদীর তীরে 'চাকমার কূল' নামে একটি ইউনিয়ন দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে এককালে চাকমারা বাস করতো বলে জনশ্রুতি রয়েছে। হয়তো এটিই সেই ঐতিহাসিক 'সাপ্রেকূল', যা 'চাকমার কূল' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। তবে পার্বত্য গবেষক, লেখক অংশুই মারমা, বর্তমান আলীকদম-এর চতুঃপার্শ্বস্থ এলাকাকেও সাপ্রেকূল বলেছেন। (অংসুই মারমা-প্রবন্ধ/ মারমা নৃগোষ্ঠীর উপাধি, কবরক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি, ২০১৪, পৃঃ-৮৬)। কান পাতলেই ইতিহাসে সাপ্রেকূলের অনুরণনও শোনা যায়। জানা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম মূলত কুকি দলের নানা উপজাতি দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। পরে কুকিদের আরো উত্তর-পূর্ব দিকে বিতাড়িত করে চাকমারা বাংলাদেশের চট্রগ্রামের দক্ষিণাংশসহ আরাকান দখল করে। ড. হেইন্স বেকার্ট এর প্রবন্ধ 'দ্য চাকমাস' এর আলোকে বলা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে চাকমারা মাতামুহুরী নদী সংলগ্ন দক্ষিণের পাহাড়ি এলাকায় বসবাস করতো। তখন চট্রগ্রামের দক্ষিণাংশ তথা সাতকানিয়াও চাকমা অধ্যুষিত ছিল। কক্সবাজারের হারবাঙ এর রাখাইন সমাজে জনশ্রুতি আছে, সাতকানিয়া নামটি এসেছে চাকমা 'সাককান্যা' (চাকমা রাজকন্যা) শব্দ থেকে। ব্রিটিশ জরিপ কর্মকর্তা মি. রেনেল পরবর্তীকালে (১৮৮৩ ইং) ঐ এলাকার নাম উল্লেখ করেন Saccanya বলে। তবে ব্রহ্মযুদ্ধের সময় (১৮২৪-১৮৫২) আরাকান হতে মগরা এসে এই এলাকা (সম্ভবত সাপ্রেকূলসহ চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশ) থেকে চাকমাদের বিতাড়িত করে চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণ অংশ অধিকার করলে চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে আশ্রয় নিয়ে সেখানে

স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। অবশ্য ষোড়শ শতকেও চাকমাদের মূল জনগোষ্ঠী চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের কর্ণফুলি অববাহিকায় যে স্বাধীনভাবে আলাদা রাজ্যে বসবাস করতো, তার নজিরও ইতিহাসে রয়েছে। পর্তুগিজ নাবিক Zoa De Borrows ১৫৫০ সালে 'Descripcao Do Reino De Bengla' নামে একটি মানচিত্র আঁকেন। এতে ২৩ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৪ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে কর্ণফুলি নদীর অববাহিকায় 'CHACOMAS' নামে একটি জায়গা চিহ্নিত করেন। (Jarnoul of the Asiatic Society of pakistan.Vol-8, No-2,1963)। অনেকেরই ধারণা, এটি চাকমাদেরই বসতি অঞ্চল। এছাড়া নিকট অতীতে, ১৮৬০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক চাকমা রাজ্য সম্পূর্ণ দখল করার আগে চাকমা রাজাদের প্রশাসনিক সদর দপ্তর বা রাজধানী ছিল চাকমা রাজ্যের সবচেয়ে বড় ও উৎপাদনশীল তালুক চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার রাজানগরে। পরে এ দপ্তর রাঙামাটিতে সরিয়ে নেওয়া হয়। বর্তমানে চাকমা রাজা হিসেবে রাঙামটিতে সমাসীন আছেন ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, তিনি রাজত্ব করেন, কিন্তু শাসন করেন না। তার 'রাজা' পদবিটি প্রতীকী পদমাত্র।

বাংলাদেশের আদিবাসী সাহিত্য বিষয়ক মাসব্যাপী ভার্চুয়াল আলোচনা

বাংলাদেশ মণিপুরি সাহিত্য সংসদ, চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস রাইটার্স ইউনিয়ন, থকবিরিম এবং মণিপুরি মিরর এর যৌথ আয়োজনে ২০২১ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে 'বাংলাদেশের আদিবাসী সাহিত্য: অনুদঘাটিত এক গোপন ঐশ্বর্য' শিরোনামে বাংলাদেশের আদিবাসী সাহিত্য নিয়ে মাসব্যাপি এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলাম। বাংলাদেশের আদিবাসীদের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য নিয়ে মোট ১৪টি পর্বে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি আদিবাসী কবিদের স্বরচিত কবিতা পাঠ এবং আবৃত্তির আয়োজন ছিলো। ইউটিউব ও ফেসবুক মারফত অসংখ্য মানুষ সেই আলোচনা শুনেছিলেন সরাসরি। আমাদের মনে হয়েছিলো, কোভিড-সময়ের বাংলাদেশের আদিবাসী সাহিত্য নিয়ে এই অসামান্য আলোচনাগুলো লিখিতভাবেও ধরে রাখা প্রয়োজন। তাই, আয়োজকদের সম্মতিক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পর্বের আলোচনা লিপিবদ্ধ করার পরিকল্পনা করেছিলাম।

এখানে মাসব্যাপি ভার্চুয়াল আলোচনা সভার সমাপনি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন-কবি প্রবন্ধকার হামোম প্রমোদ, আনন্দ জ্যোতি চাকমা, মথুরা বিকাশ ত্রিপরা, কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা, মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি, আদিবাসী নেতা, সংগঠক সোহেল হাজং, কবি মিঠুন রাকসাম, কবি, লেখক থিওফিল নকরেক এবং লেখক, প্রবন্ধকার এ. কে. শেরাম। সঞ্চালক আনন্দ জ্যোতি চাকমা, প্রধান অতিথি মুহম্মদ নূরুল হুদাকে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করতে বলেন- সম্পাদক, 'কথা'।

মুহম্মদ নূরুল হুদা: প্রারম্ভে সবাইকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আজকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাসব্যাপী আলোচনা করছেন। যদিও এটা শোকের মাস তেমনি শোককে পার হয়ে শক্তিতে পরিণত করার মাসও বটে। কারণ শোক কখনও চিরস্থায়ী হয় না। আমাদের জন্মের পর প্রত্যেক ব্যক্তি, পারিবারিক, গোত্র ও সমস্ত মানব জাতির জীবনে বারে বারে শোক আসে এবং সেই শোককে অতিক্রম করে অশোকে পরিণত

হয়। অশোক শুধু সম্রাট অশোক নয়। অশোক মানে শোককে জয় করে নিয়ে বীরসত্তায় করাই হচ্ছে শোক। একই জিনিস আমরা দেখেছি ১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এ একজন ব্যক্তিকে সরিয়ে দিয়ে তার ব্যক্তিসত্তাকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করতে চেষ্টা করা হয়েছে এবং তারপর বৃহত্তর যে বাঙালি গোত্র, যে জাতিসত্তার বিকশিত হয়েছে যা অনুপূরক সত্তা হিসেবে এখানে অত্যন্ত পঞ্চাশটির অধিক হিসেবে জাতিগোষ্ঠীর বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্বকে সনাক্ত করতে বাধা দেওয়া হয়েছে বলে আমি মনে করছি। কারণ আমি গত দুই দশক ধরে সারা বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছি যেখানে আমাদের মূল যে বৃহৎ জাতিসত্তা রয়েছে সে জাতিসত্তার সাথে সম্মিলিত হয়ে আমাদের অনুপূরক জাতিসত্তার সাথে সম্পূরক জাতিসত্তাগুলো তারা সবাই মিলিতভাবেই আছে এবং তাদের ভেতর দিয়ে যে সম্মিলন বৈচিত্র্যের নিয়ে আসা কিন্তু সাধারণ কথা নয়। ইউনিটি, ডাইভার্সিটি, জাতি বৈচিত্র্য বিষয়টা সনাক্ত করার কাজে আমি ব্যক্তিগতভাবে ও জাতীয়ভাবে আর্ন্তজাতিক একটি সংস্থার প্রনোদনা দিয়ে একবারে সিরানিয়া থেকে শুরু করে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত কিংবা ধরা যাক আদমপুর থেকে আরম্ভ করে পঞ্চগড় পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছি এবং আমার যতদূর মনে পড়ে প্রতি অঞ্চলে আপনারা যে গোত্রের কথা বলেছেন আমি সম্ভবত প্রতিটি জাতিসত্তার গৃহে গিয়েছি। এ জন্য আমার কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে এবং আমাদের জাতিরাষ্ট্র এবং জাতিরাষ্ট্রকে জনক বলি সে জনকের মুখের ভেতরে আমি আমার আপনার মুখছবি দেখি। বিশেষত আমাদের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার যারা মানুষ আছে তাদের মুখের ভেতর যে আকৃতি নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, সে নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য খুব বেশি স্পষ্টরূপে দেখি। এটা শুধু এককভাবে নেই বৈচিত্র্যময় হিসেবেই আছে। সেখানে থেকে সাঁওতাল জাতির নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আছে।

ধরা যাক এককভাবে মান্দি সম্প্রদায়ের থিওফিল নকরেক তাঁর মুখের অবয়বে যে গোলাকার বলিষ্ঠ বৈশিষ্ট্য আছে। এটা একইভাবে যেকোন নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর মুখাবয়বে যা বাংলাদেশে পাওয়া যায় তার সমন্বয় দেখা যায়। আবার এও দেখা যাবে তাঁর পূর্বপুরুষ বহু আগে এ এশিয়া মহাদেশের তাদের দেহ অবয়বে আছে। এটি হচ্ছে বিশেষত আমাদের এশিয়া অঞ্চলের ভূমি, আবহাওয়া, বোধ, বুদ্ধি, উপলদ্ধিগত নৃতাত্ত্বিক এবং আমরা যাকে অ্যাকনোগ্রাফিক বলি। মানুষের জন্ম থেকে বেড়ে ওঠার পথ সময় যে ভৌগোলিক, আকাশ, জমি, নদীর প্রভাব তার উপর পড়ে তার ফলে বেড়ে ওঠা। এ বৈশিষ্ট্যগুলো অত্যন্ত বাঙালি জাতির কথা বলছি তার উপর বিশেষ করে তার উপর প্রতিফলিত। ফলে আমরা আমাদের নৃতাত্ত্বিক

সামাজিক আচরণগত এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ব্যক্তি পরিবার ও গোত্রে গিয়ে একেক ধরনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটা স্বতন্ত্র সত্তা থাকলেও আমাদের একটা বৃহৎ অন্বিত সত্তা আছে। এ যে স্বতন্ত্র সত্তাটি এটি শুধু ধরা যাক মান্দি সম্প্রদায়ের সঙ্গে হাজং সম্প্রদায়ের সঙ্গে যে স্ট্যাবল সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। যেটা মৈতৈ এর সঙ্গে যে বিষ্ণুপ্রিয়ার পার্থক্য আছে যেটা নয়। আপনি দেখবেন বড়ো মুসলিম সম্প্রদায়ে সৈয়দ বংশের সঙ্গে অন্য কোনো বংশে পার্থক্য সবসময় থাকবে। আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি সে অঞ্চল হচ্ছে দরিয়ানগর। দরিয়ানগরের পাশে গড়ে ওঠা একটা অঞ্চল আমার মুখের এবং ভাষার বৈশিষ্ট্যের ভেতর যে বৈশিষ্ট্য আছে তার সঙ্গে উত্তর প্রান্তে গিয়ে আমি যদি কিশোরগঞ্জে চলে যায় সেখানে দৈহিক এবং ভাষিক উচ্চারণগত পার্থক্য দেখা যাবে। এ পার্থক্যটা সারা পৃথিবীতে বিদ্যমান।

আমরা জানি, ভাষিক বৈশিষ্ট্য যদি বাংলা ভাষার কথা বলি চট্টগ্রামের বাংলা ভাষা আর নোয়াখালীর বাংলা ভাষা কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও এক নয়। আবার চট্টগ্রাম থেকে নোয়াখালী পার হয়ে যদি মণিপুরি এলাকা ঘেষে অন্য দিকে কুমিল্লা হয়ে সিলেটে প্রবেশ করি তাহলে সিলেটের যে মুখের ভাষাটি যার লিপি নাগরি বাংলার সাথে যেভাবে মেলে না একবারে হুবহু মেলে না কিন্তু মেলে অনেক কিছুই মেলে আবার অনেক কিছুই মেলে না। কি মেলে আর কি মিলে না এ বিষয়গুলোই আমরা স্টাটলভাবে দেখি না। তবে যেসব পরিবার গোত্রের মধ্যে যেসব জাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে উচ্চারণগত পার্থক্য সত্ত্বেও লিপিবদ্ধকারদের শক্তিটা আছে। তারা ঐ দালিলিক ডকুমেন্টারি হিসেবে আছে। যা তারা ভাষিক অভিব্যক্তিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। যেমন আপনাদের মধ্যে চাকমা জনগোষ্ঠীর নিজস্ব লিপি আছে। সে লিপি তাদের নিজের কাছে থেকে হতে পারে অথবা অন্যকোনো বৃহৎ লিপিকে তারা যুগ যুগ ধরে গ্রহণ করেছে তা হতে পারে। মণিপুরিদের নিজস্ব লিপি আছে। মৈতৈদের নিজস্ব লিপি আছে। মান্দিদের নিজস্ব লিপি ছিলো বোধহয় হারিয়ে গেছে। আমি যতদূর জানি, এ লিপিকে পুনরুদ্ধারের কাজ চলছে। খুমি বা খিয়াংদের উচ্চারিত ধ্বনি আছে লিপি নেই। হাজংদের লিপি নেই কিন্তু উচ্চারিত ধ্বনি আছে এবং নিশ্চয় সুদূর অতীতে লিপি ছিলো। এখন কথা হলো লিপি যদি না থাকে তবু ভাষা বেঁচে থাকে। আমরা যে বৃহৎ জাতিসত্তা বাংলা ভাষার কথা বলছি। সেই বাংলা ভাষা বা বাঙালির সাথে কিন্তু আপনারা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এ জন্যই আমি বলেছি অনুপূরক জাতিসত্তা। একটা বৃহৎ জাতিসত্তার সাথে অনুপূরক জাতিসত্তাকে অ্যাক্টিং সোসাইটি বা ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বলা যেতে পারে বা অন্য কিছু বলা যেতে পারে। কিন্তু উপজাতি কথার সাথে আমি মোটেও একমত নই। পৃথিবীতে উপজাতি বলতে কিছু

নেই। আমার আকার ছোট-বড় হতে পারে এই শুধু পার্থক্য। আমি যে বার বার খিয়াং বা খুমিদের কথা বলছি। আপনারা জানেন, তারা প্রায় অ্যাকস্টিং তাদের অস্তিত্ব নেই। যেখানে তেরোটার মতো জাতিগোষ্ঠী ছিলো বলে জানতাম এখন এগারোটার মতো আছে। তাহলে দুইটি জাতিসত্তা কোথায় হারিয়ে গেলো আমরা জানি না। আবার কোনো জাতিসত্তা বড় আছে যেমন– ত্রিপুরা জাতিসত্তা। এটি বাংলাদেশেও আছে, ভারতেও আছে। কিংবা মণিপুরি জাতিসত্তা দুই দেশে বিভক্ত হয়ে আছে। এ জাতিসত্তাকে বৃহৎ জাতিসত্তা বলা যেতে পারে। আমাদের এখানে এসে এ জাতিসত্তা খণ্ডিত হয়েছে। এবং এর মধ্যে দুই বা তিনটি রূপ ধারণ করেছে। যেমন– বিষ্ণুপ্রিয়া, মৈতৈ ও পাঙন। আমাদের যে ভিন্নতা, তা আমাদের ঐক্যের ক্ষেত্রে কোনোভাবে বাধা হতে পারে না। যদিও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আমরা তাকাই পৃথিবীতে ডাইভারসিটি কালচারাল প্রচলিত আছে। ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে কালচারাল ডাইভারসিটি কনভেশন ইউনেস্কোতে গৃহীত হয়েছিলো। আমার সৌভাগ্য হয়েছিলো সেই সময় বাংলাদেশের এক্সপার্ট প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে উপস্থিত ছিলাম এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমি এটি গ্রহণ করেছিলাম এবং দেখেছি যে, আমি যদি কালচারাল ডাইভারসিটি গ্রহণ করি ধরা যাক অন্য দিকে এগিয়ে যাওয়া ফরাসি যে জাতি সোসাইটি, ইংরেজ যে সোসাইটি বা অস্ট্রেলিয়া জাতি সোসাইটি, তাদের সঙ্গে এক রৈখিকভাবে একই মালায় আমরা গেঁথে যায়। বাংলাদেশের ভেতর এ মালার ভেতর বাঙালি যে সূত্রমালা, বাঙালির সাথে আরো ৫০টির অধিক জাতির সূত্রমালাকে নিয়ে যেমন বাঙালি জাতিসত্তা তেমনি এটি আমি মানবজাতিসত্তা হিসেবে, এক জাতিসত্তা হিসেবে দেখতে চায়। তাহলে এই বৈচিত্র্য জাতিসত্তাকে আমাদের এক জায়গায় নিয়ে আসতে পারবো।

যদি বাঙালি জাতি ইংরেজ জাতির সঙ্গে, ইংরেজ জাতি যদি ফরাসি জাতির সঙ্গে, ফরাসি জাতি কিউবান জাতিসত্তার সঙ্গে এভাবে মিলিত না হয় তাহলে আমাদের স্বাতন্ত্র্যের ঐক্য থাকে না। ঐক্য তখনি থাকবে যখন স্বাতন্ত্র থাকবে। ধরা যাক, বাংলাদেশেই পাহাড়ি অঞ্চলে না গিয়ে সমতল অঞ্চলে এক জায়গা থেকে এক জায়গায় হেঁটে বেড়াই তখন দেখতে পাই আমাদের ভাষা ৫ মাইল অন্তর অন্তর পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। আমি যখন বাড়িতে ছিলাম তখন শোনতাম দাদি বলতেন মুই। আমার এলাকা ছেড়ে আরেকটু এগিয়ে ৫ মাইল উত্তরে চিরিঙ্গাই গেলে মুই থেকে হয়ে গেলো আই অর্থাৎ এটি চাঁদগাইয়া ভাষা। মুই আর আই এর মাধ্যমে অনেক ফারাক। এ ভিন্নতা সত্তেও আমাদের ঐক্যটাকে গ্রহণ করতে হবে। এ পরিবর্তনের ধারাগুলো আমরা গ্রহণ করে নিয়েছি।

বাঙালি জাতিসত্তা যদি স্বাধীনতা না পেতো তাহলে আমিও এ জাতিসত্তার বৃহৎ অংশে স্বাধীন হতে পারতাম না বা ক্ষুদ্র জাতিসত্তা অর্থাৎ আপনারা স্বাধীন হতে পারতেন না। বাঙালি ও বাংলা অন্যান্য জাতির জন্য স্বাধীনতা জরুরি ছিলো বলে আপনারা মান্দি সমাজ থেকে সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সমাজ ও বাংলাদেশের সকল মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে দেশকে স্বাধীন করেছিলেন। বাঙালির যে ইচ্ছা তার অভিপ্সা তার প্রতিফলন আমরা দেখেছি। ফলে এই জাতিসত্তাকে একটি বিভিন্ন ক্ষুদ্র, মাঝারি বৃহৎ এ জাতীয় উপকণের জাতীয় বিচিত্র্যময় উপকরণের সমন্বয় হিসেবে আমরা দেখি। যদি এটা দেখি তাহলে আমরা বলবো এ জাতিসত্তার মিলনের সূত্র হচ্ছে নকশিকাঁথা। এটি বাঙালিদের পক্ষ থেকে বলা হয়। অথবা পার্বত্য চট্টগ্রামকে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের ক্যাটালগকে বলি তাহলে আলাম। যদি আমি বলি উত্তরাঞ্চলের যে জাতিসত্তাগুলো আছে তাদের নকশার কথাগুলো বলি ওয়াকুসুয়া। একইভাবে এই যে নকশা আমাদের বাংলাদেশের যে ম্যাপের দিকে তাকালে দেখা যাবে একটা পাখি যেনো ওড়ে যাচ্ছে। যে পাখির ভেতর আমাদের প্রত্যেকের সত্তাগুলো নিয়ে আসি একেকটা নকশা। সেই নকশা সম্পর্কে আমরা একত্র হবো। যেকোনো প্রকারেই আমাদের নকশাগুলো এক রেখে আমাদের এ ওড়ে যাওয়া পাখির নকশাটাকে ধারণ করতে হবে। এটাই আমাদের ওড়ে যাওয়ার শক্তি। তাহলে আপনারা যথার্থ বলেছেন এ সত্তাগুলো এক দশক ধরে বলা হবে তখন মূলত যে কথাটা বলতে হবে আমরা যতই বৃহৎ জাতিসত্তার কথা বলি অথবা বৃহত্তম মানবজাতিসত্তার কথা বলি না কেনো আমরা যে পরিবারে বা যে পিতামাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি সেই শিখরে ফিরে আসতে হবে।

জন্মগ্রহণ করার পর যে কথাবার্তা শোনে এসেছি, যে উচ্চারণ করেছি, যে সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি করেছি, সেগুলো আমাদের ধারণ করতেই হবে। আমাকে আমার ওয়ানগালাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। বিগর্তিত হয়ে তাতারা রাবুগাকে ছেড়ে হয়ে গেছে খ্রিষ্টের আশ্রয়ে। তা হতে পারে অসুবিধে নেই। কিংবা আমার লাইহারাওবা, ইদ, পূজা পার্বন ও দূর্গাকে দেখতে হবে। সবাইকে নিয়ে আমাদের এক জায়গায় থাকতে হবে। কাউকে আমরা হারাতে পারবো না। তাতারা রাবুগাকে ধর্মীয় হিসেবে গ্রহণ না করলেও ইনিই যে আমার ঐতিহ্য বিশ্বাসের শুরু এ কথাটি আমি তো ভুলতে পারি না। আমি যতই ইংরেজি ভাষা গ্রহণ করি না কেনো, যতই সম্মুন্নত হই না কেনো, ইউরোপিয় ঐতিহ্যের উপাদান গ্রহণ করি না কেনো, আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বুনোময়, সবুজময় ও প্রাণবাদকে হারাতে পারি না।

ফলে আমাকে নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে হবে। রক্ষা করার কথা সম্পর্কে আপনারা বলেছেন যারা এপর্যন্ত এক্সট্রিন্ট হয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে কিন্তু আমি বলি হারিয়ে যায়নি। পৃথিবীতে কেনো কিছুই হারিয়ে যায় না। আমাদের স্মৃতি বা মেমোরির মধ্যে থাকে। মেমোরি এক্সেসসিটি থেকে হারাতে কম পক্ষে পাঁচশত বছর সময় লাগে। পাঁচশত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর কোনো জাতির অস্তিত্ব পাওয়া না যায়, তখন বলা যেতে পারে হ্যাঁ আমরা সে জাতির দূরে চলে গেছি বা হারিয়ে ফেলেছি। এর জন্য ইউনেস্কো বলে, একটি জাতি বিশেষ করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বা জাতি সত্তা মেমোরিতে পাঁচশত বছর টিকে থাকে। যদি পাঁচশত বছর টিকেই থাকে তাহলে মেমোরি থেকে উদ্ধার করতে পারবো। উদ্ধার করতে হয় তাহলে প্রথমেই সে জাতির হারিয়ে যাওয়া ভাষা ও অক্ষরের স্মৃতিকে উদ্ধার করা উচিত। পাশে যে অক্ষরগুলো আছে, যেমন– জাতীয় অক্ষর আর্ন্তজাতিক অক্ষরটা খোঁজে নিয়ে আসতে হবে। আমার কাছে জাতীয় অক্ষর হচ্ছে বাংলা ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ হয়ে হয়েছে বাঙালি এবং অনুপূরক জাতিসত্তার অনেকগুলো জাতিগোষ্ঠী; যেমন– ধর্মীয় দিক থেকে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান আর কর্মের দিকে থেকে কৃষক, শ্রমিক, জেলে, তাঁতি ও জুমচাষী ইত্যাদি। আর অন্যান্য বিশ্বাসী হিসেবে তো অনেক আছেই। যদি অক্ষর না থাকে তাহলে প্রথম হবে আমাদের বাংলা অক্ষরকে ধারণ করা। বাংলা অক্ষরের অনুকরণে আরেক প্রয়োজনীয় অক্ষরগুলো সৃষ্টি করা। বাংলা অক্ষরের বিবর্তনের দিকে যদি খেয়াল করি এখানেও তাই দেখবেন। আগের যে প্রাকৃত অক্ষরগুলো তা হুবহু নয় কিন্তু পরিমার্জন বা পরিবর্তন করে আজকে আমরা এ অক্ষরটি পেয়েছি। আর যদি এটা না হয় আর্ন্তজাতিক ইংরেজি অক্ষর নেওয়া যায়। তাহলে সেটাও নিয়ে নেওয়া ভালো।

আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে জানি তারা ইংরেজি অক্ষরকে গ্রহণ করে রোমান হরফ দিয়ে তাদের ভাষা লিখিতভাবে চর্চা করছেন। রোমান একটি আর্ন্তজাতিক হরফ পৃথিবীর অনেক জাতিই এটি গ্রহণ করেছে। কাজেই আমরা গ্রহণ করতে পারি। এর সাথে বাংলা অক্ষরটিও গ্রহণ করতে পারি। তবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনারা নিজেরা যদি অতীতের কোনো ঐতিহ্য না থাকলেও একটি ভাষা অর্থাৎ লিখিত অক্ষর তৈরি করতে পারেন। যে ম্রো জাতিসত্তা একজন অক্ষর তৈরি করেছেন তেমনি আপনাদের মধ্যে প্রতিটি জাতিই অক্ষর তৈরি করতে পারেন। অক্ষর তৈরি করা তেমন কষ্টের কাজ বা ব্যাপার নয়। যেহেতু বাংলা ও ইংরেজি আছে তাই সহজ শর্তেই অক্ষর তৈরি করে নিতে পারি। এই ইউনিবেটিভ কাজগুলো করতে হবে। আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো সেটি হলো

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিষয়। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এটিও একটি জরুরি উপাদান। আমি পার্বত্য অঞ্চলের ১১টি যে অ্যাক্টিং সোসাইটি আছে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে শনাক্ত করতে চেষ্টা করেছি। যা গত দুই বছর ধরে একটি প্রকল্প নিয়ে কাজ করেছিলাম। তখন থেকেই সাংস্কৃতিক শনাক্তের কাজ করেছি। আমরা জানি অ্যাক্টিং সোসাইটি অনেক নৃত্য নানা নামে ছিলো। এগুলো কীভাবে প্রচলিত ছিলো তা পূর্নজীবন করা হয়েছে। আমাদের অনেক বাঁশি ছিলো যা হারিয়ে গেছে। একই বাঁশির যে অনেক মুখ আছে, যেমন– ম্রো বাঁশি আছে কিন্তু সেটার আরো বৈচিত্র্যময় উদ্ভাস আমরা করাতে পারি এবং আদিতে কিছু ছিলো সেটা অবশ্য এখন আমরা জানি না সেটা উদ্ভাবন করা যেতে পারে। একইভাবে আমাদের বাঙালি জাতিসত্তার গান উদ্মার গান বলে একটি মহিলাদের নৃত্য ছিলো প্রায় বস্ত্রহীন নৃত্য। উদ্মা অর্থ মেঘের গান। উত্তরবঙ্গে যখন খরা আসতো মেঘদেবীর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করে এই নৃত্য করা হতো। এটি বাঙালি জাতিসত্তার ঐতিহ্য থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এটি নতুনভাবে নতুন পরিবেশে এ নৃত্যকে আবার জাগাতে বা পূর্নজীবন দিতে পারি এবং যখন এ নৃত্য করবে তখন বাড়ি বা ঘরের পুরুষদের বের করে দিয়ে শুধু মহিলারা আকাশ, বাতাস, আল্লাহ, ঈশ্বর ও মেঘদেবীর কাছে নৃত্য করে প্রার্থনা করবে।

শুধু ভাষা, অক্ষর, বাঁশি নয়, দেহের যে আন্দোলন এ বিষয়গুলো ফিরিয়ে আনতে হবে। আপনাদের লোকসাহিত্য, গীত, মাটি, বাঁশ, বেতও তাতের যে হস্তশিল্পগুলো ছিলো এগুলো ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। আমি ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে মৈতৈ অঞ্চলে দেখেছি হামোম তনু বাবু তার পিতার নামে যে জাদুঘরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলো যাতে মণিপুরিদের/মৈতৈদের বিভিন্ন তৈজস, কৃষি, মৎস যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে প্রায় ১০০টির উপর যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ করা হয়েছে। এভাবে শুধু জাতিগোষ্ঠী নয় প্রতিটি গোত্র থেকেও মূর্ত-বিমূর্ত বিষয়গুলো দিয়ে জাদুঘর বানিয়ে লোকশিল্প, কৃষি যন্ত্রপাতি, মৎস্য যন্ত্রপাতি, হস্ত যন্ত্রপাতিগুলো সংরক্ষণ করা উচিত। সকল সৃষ্টিশীলতা ভাষা, সংস্কৃতি, গান, নৃত্য ও কবিতার মতো সৃজনশীলতাকে চর্চা ও সংরক্ষণ করতে সচেষ্ট করতে হবে। এই সৃজনশীলতা রক্ষা করতে হলে প্রথমে ভাষাকে অক্ষর দিয়ে জাগ্রত করতে হবে। যদি এ ভাষা ও অক্ষরকে নিয়ে কাজ করেন তাহলে আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আপনাদের সুরক্ষা ও সাহায্য করবে সর্বত্র উজাড় করে। আর দেশীয়ভাবে বাংলা একাডেমি আপনাদের পাশে সাহায্য সহযোগিতায় থাকবে। যেহেতু আমি দুই দশক ধরে সারা বাংলাদেশ জুড়ে এসকল কাজ করছি তাই আপনাদের সহযোগিতা করা বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা হিসেবে আমার দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। এছাড়া আমার আন্তর্জাতিক

মহলের সাথেও পরিচয় আছে। আইডেনটি ফিকেশন ভেল্যয়েশন ইনটেলেকচুয়াল প্রপারটিশন ট্রেডিশনাল কালচারেশ এক্সফেশন অব বাংলাদেশ হয়ে আমি কাজ করেছি; তাই আমি জানি, এ কাজের ভেতর নান্দনিকতা শুধু নয়, আছে অর্থলোজিক সুরক্ষাও আছে ও ইকোনমিক ভেরিভিকেশনও আছে। আপনারা যদি আগ্রহ হোন তাহলে এ বিষয়ে সহযোগিত, সহায়তা দিতে আমি প্রস্তুত আছি। আপনাদের সকলের গ্রহণীয়তা সহায়তায় সফলতা লাভ করতে পারি। আপনাদের এ জলসা, আসর কিংবা অর্ন্তজালে অন্তর দিয়ে যুক্ত হবো। আপনারাও আমার সাথে অন্তর দিয়ে যুক্ত হবেন ফলে 'Not it little sound is national so will grow intel universal so if is co-operetive positive in webtive' আন্তর্জাতিক ভাষায় বললাম কারণ জাতি থেকে আন্তর্জাতিক সৃষ্টি। আসুন এভাবেই আমরা যেভাবে নদী থেকে বঙ্গোপসাগরের থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে মিলিত হই। গিরীচূড়া আর তরঙ্গচূড়া যেন এক হয়ে যায়। শেষ দিকে কবিতার সুরে আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানালাম। ধন্যবাদ আপনারা আমাকে যারা নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং শোনেছেন। সকলকে শুভ সন্ধ্যা।

আনন্দ জ্যোতি চাকমা: ধন্যবাদ বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। এখন আমরা আরেকজন আলোচক কবি মিঠুন রাকসামের কাছে তাঁর কথাগুলো শুনব।

মিঠুন রাকসাম: বাংলাদেশের আদিবাসী সাহিত্য নিয়ে মাসব্যাপী নিয়ে ভার্চুয়াল আয়োজনের প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি এবং যারা যুক্ত আছেন সবাইকে গারো সাহিত্য পত্রিকা থকবিরিমের পক্ষ থেকে শুভ সন্ধ্যা ও শুভেচ্ছা। যেহেতু বাংলা একাডেমির পরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা আছেন। তাই আমি আমার শুভেচ্ছা বক্তব্যে কিছু প্রস্তাবনা আনতে চাই। আদিবাসী প্রকাশনাগুলোর পক্ষ থেকে বলতে চায়। বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে যে একুশে গ্রন্থমেলা হয় সেখানে আদিবাসীদের জন্য একটি প্যাভিলিয়ন বরাদ্দ চাচ্ছি। যেখানে আদিবাসীদের নিজেদের প্রকাশিত ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বইগুলো থাকবে, ম্যাগাজিন থাকবে। আদিবাসীদের যে বইয়ের মাধ্যমে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরতে চাই এবং আদিবাসী সাহিত্যের জন্য বাংলা একাডেমিতে আদিবাসী গবেষণা বিভাগ তৈরি করা। যে বিভাগে আদিবাসী বান্ধব আদিবাসী গবেষকগণ এবং আদিবাসীদের নিয়ে যারা কাজ করছেন তারা কাজ করতে পারবেন। এ বিভাগ খুললে আমরা নির্ভয়ে কাজ করতে পারবো এবং আদিবাসীদের কাজের পরিধিও বাড়বে। আমাদের মধ্যে যারা সিনিয়র লেখক আছেন তাদের বই প্রকাশ করার জন্য আমি বিনীত অনুরোধ

রাখতে চাই এবং আদিবাসীদের মধ্যে যারা পুরস্কার পাবার মতো কাজ করেছেন তাদেরকেও যেন পুরস্কার দেওয়ার সময় সুবিবেচনা করেন। আমি আর বেশি কিছু বলবো না। আমরা এই করোনার সময় একমাস ধরে যে সাহিত্য মিলনমেলা করেছি। করোনা শেষ হওয়ার পর আমরা যেন মিলন মেলায় নিজেদের মধ্যে পরিণত করতে পারি। সবাইকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আনন্দ জ্যোতি চাকমা: আপনি সুন্দর কথা বলেছেন। মিঠুন রাকসাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আদিবাসী লেখকদের প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থসমূহ

কী তেষ্টায় ফুরোয় জীবন, জানে না নদী!
উনাইশৈ মারমা

রাইবতি
মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা

নাকেস্থানা লাকপদা
হামোম প্রমোদ

স্ববনর জীংকানি
রাঙাবেল চাকমা

চোরা বাঁক
চিংলামং চৌধুরী

মান্দি পাড়ার দুঃখ
মিঠুন রাকসাম

বিপাক জনম
রাঙাবেল চাকমা

হারিয়ে যাওয়া সম্পর্ক

থোকচোম কেনাহান দেবী

সম্ভ্রান্ত বনেদী এক পরিবার। পুরো এলাকায় সুরেন্দ্র উকিলের অনেক নাম ডাক। তিন ভাই বোনের মধ্যে সুরেন্দ্র সবার বড়। ছোট ভাই কুমার হলো হাইস্কুলের শিক্ষক। লম্বা একহারা চেহারার সুশ্রী নুংশিরে বয়সে কুমারের চেয়ে বড় আর সুরেন্দ্র'র চেয়ে ছোট। এলাকায় এমন কোন যুবক নেই যে নুংশিরে এর রূপে মুগ্ধ নয়। তারপরেও শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান হওয়ায় তাকে কেউ ঘাটাতে সাহস করে না। বড় ভাই সুরেন্দ্রর ভয়ে কোন যুবকই তার বাড়ির আশেপাশে আনাগোনা করতে সাহস পায় না। সেই সময় নারী শিক্ষার প্রচলন না থাকায় শিক্ষিত মেয়েদের লোকে মন্দ চোখেই দেখত। বাড়ির কাছে একটা স্কুল থাকায় নুংশিরে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছিল, তাই সে ভালোভাবে লিখতে পড়তে পারত।

ভানুবিলের টিলা এলাকার বাড়ি থেকে আদমপুর বাজার পর্যন্ত ব্যাগ কাঁধে নিয়ে হেঁটে আসা হলো সুরেন্দ্রর প্রতিদিনের রুটিন। ছোট কাঁচা রাস্তার কারণে প্রায় দুই মাইল গাড়ি যাওয়ার মতো অবস্থা নেই। তবে বাজার পর্যন্ত গেলে সবসময় গাড়ি পাওয়া যায়। তাই মৌলভীবাজার কোর্ট অফিস পর্যন্ত যাওয়ার জন্য সুরেন্দ্রকে জিপ গাড়িতে চড়ে ভানুগাছ পর্যন্ত যেতে হতো, তারপর আবার গাড়ি পরিবর্তন করতে হতো। সন্ধ্যার নিভু নিভু আলোতে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে ক্লান্ত শরীরে সুরেন্দ্র প্রতিদিন বাড়ি ফিরতেন।

দেখতে সুরেন্দ্রর বয়স পঞ্চান্ন কিংবা ছাপ্পান্ন মতো লাগে। মাথায় পাকা চুলের আনাগোনা দেখা যায়। সব ভাই বোনই সুন্দর এবং সবল দেহের অধিকারী। ছোট ভাই কুমারও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রত্যেক ভাই বোনই দেখতে মার্জিত ও পরিপাটি। ইবেমহল'রা যখন স্কুলে যেত, রাস্তায় তাঁদের সাথে মাঝে মাঝে দেখা হয়ে যেতো।

আজ থেকে ৩৫/৪০ বছর আগে গ্রামাঞ্চলে সবাই ঢেঁকি ছাঁটা ধানের চালের ভাত খেত। তারপর অটো রাইস মিল আসার পর আর কেউ ঢেঁকিতে ধান ভানে না। নতুন প্রজন্মের কেউ ঢেঁকি চেনে না। ঢেঁকি দেখতে কেমন এটাও অনেকেরই প্রশ্ন।

সবাই মেশিনে ভাঙা চালই খাচ্ছে। শুধু তাই নয়, মেশিনে ভানা চালও এখন আর কেউ নিজে ঝাড়া দেয় না। এক মন চাল ঝাড়ার বিনিময়ে অন্যকে এক কেজি চাল দিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ইবেমহল ও এগারো বারো বছর বয়সে মায়ের সাথে ঢেঁকিতে ধান ভানত। মা চাল ঝাড়া দেওয়ার সময় সে ঢেঁকিতে চড়ে কোনমতে পাড়া দিয়ে ধান ভানার চেষ্টা করত। মাঝে মাঝে ঢেঁকির মাথায় দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে টেনে ঢেঁকিতে পাড়া দিত। মা মাঝে মাঝে বলতেন, এখন যখন পারিস না, তখন তোর ধান ভানার এতো ইচ্ছা। কিন্তু ভবিষ্যতে যখন একই কাজ করার মতো বয়স হবে, তখন আর করার ইচ্ছা হবে না। সেই সময়- পঞ্চাশোর্দ্ধ এক বৃদ্ধা তার নাতিকে নিয়ে প্রতিদিন গ্রামে ধান ভানতে আসতেন। প্রতিনিয়ত ধান ভানার কারণে একদিনও ফুরসত হতো না। তাই, ধান ভানতে হলে বৃদ্ধাকে আগেই বলে রাখা লাগতো, না হলে সপ্তাহে যে কোন দিনের জন্য আগাম একটা দিন নেওয়া হতো। এক মন ধান ভানার পারিশ্রমিক ছিল মাত্র দুই সের ধান। অনেকেই অবশ্য বুঝে মাঝে মাঝে পারিশ্রমিক বাড়িয়ে দিতেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই ধান ভানার কাজ চলত। তারপর দিনশেষে পারিশ্রমিক হিসেবে পাওয়া দুই সের চাল নিয়ে বাড়ি ফেরা হতো। কতো কষ্টের এই জীবন!

ধান ভানার সময় বৃদ্ধা দাদী ও নাতির এই কষ্ট দেখে ইবেমহলের অনেক খারাপ লাগে। মাকে বললো, উনাদের একটু ভাত খেতে দাও, ক্লান্তিতে তারা বসে আছে। পাশ থেকে শুনে মেজো কাকি বললেন, কর্মদোষেই উনার এতো ভোগান্তি। কি আর করা, জগৎ সংসারে বেঁচে থাকতে হলে খেয়ে পরে বাঁচতে হবে। ইবেমহলকে মেজো কাকি বৃদ্ধার জীবন কাহিনি বলতে লাগলেন, বৃদ্ধা হলো সুরেন্দ্র উকিলের একমাত্র ছোট বোন। আর কুমারের হলো বড় বোন। জানার আগ্রহ নিয়ে ইবেমহল জিজ্ঞেস করতে থাকে।

মেজো কাকি, কীভাবে এই অবস্থা হলো?

"কুকুরকে রথ চড়ালেও, ময়লা দেখলেই লাফ দেয়" ভালো ভালো পরিবার, বাড়ি থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসছিলো। আর সে কিনা পাশের বাড়ির দিন আনে দিন খাওয়া এমন যুবকের সাথে প্রেম করে বাড়ি থেকে পালাল। এই যুবকের শুধু বসত ভিটায় আছে। ক্ষেত খামার, জায়গা কিছুই নেই। বাড়ি বলতে শুধু ছোট্ট একটা কুঁড়েঘর। তারপর লোকলজ্জার ভয়ে ভাইয়েরা সামাজিক স্বীকৃতি দিল, কিন্তু মনে মনে মৃত ভেবে বোনের সাথে আর কোন যোগাযোগ রাখলো না।

কাকি, উনার স্বামী কী কাজ করতো?

আরে যখন যে কাজ পেতো, তাই করতো। স্বামী বেঁচে থাকতে বৃদ্ধার খাওয়া দাওয়ার কোনো কষ্ট হতো না। স্বামীর অল্প রোজগারেই দিন চলে যেত। কাজের জন্য বৃদ্ধাকে বাড়ির বাইরে যেতে হতো না।

কাকী, উনার স্বামী কত দিন হলো মারা গেছেন?

অনেক দিন হয়েছে, সন্তান বড় হওয়ার পর মারা গিয়েছেন। তাদের দুই মেয়ে, মেয়ে দুটো দেখতে শুনতে মায়ের মতোই সুন্দরী। দুধে-আলতা গায়ে রং। নাতিটাও ঠিক এইরূপ পেয়েছে। ভালো কাপড়-চোপড় পরালে, একটু যত্ন নিলে নাতিটাও দেব সন্তান লাগতো।

উনার স্বামী কীভাবে মারা যান?

রোগে ভুগে মারা গেছেন। পুত্র সন্তান না থাকায় বৃদ্ধা এখন একাই থাকেন। দুই মেয়েরও বিয়ে হয়ে গেছে। মেয়েরা নিতে চাইলেও বৃদ্ধা সম্ভবত রাজি নন। অনেক কষ্টে পরিশ্রম করে দিনাতিপাত করছেন। সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছিলেন, ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে উনার আজ এই করুণ পরিণতি। এক সময়ের সুশ্রী নুংশিরে আজ বয়সের ভারে ন্যুব্জ, এখন আছে শুধু জীর্ণ শরীর আর কুঁচকে যাওয়া ত্বক। মাথার সব চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে। এক সময়ের ডাগর ডাগর দুই চোখে এখন অতৃপ্ততা আর বেদনায় ভরা কত কথা যে লুকিয়ে আছে।

[অনুবাদ: ময়েন্বম মেমিতা]

শেকল

নোংথোম্বম কুঞ্জমোহন

ছোট মেয়েটা ঘন ঘন শ্বাস নিতে নিতে ছুটে এল, চারদিকে তাকিয়ে তার মা কোথায় আছে খুঁজতে লাগল।

এত বড়ো খোয়াইরম্বন বাজারে সবজি বিক্রির জন্য তার মা'র কোনো নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না। যেদিন যেখানে জায়গা পেত সেখানেই বসত। বাজারের শেডে বসার সৌভাগ্য তার হয়নি। কিছুদিন আগে হাতির মূর্তির কাছে সড়কের পাশে বসত। রাস্তায় চলাচলে অসুবিধে হয় বলে পুলিশ তাড়া খেয়ে সেখানে আর বসে না। এখন বাজারের পশ্চিম প্রান্তে মাটির হাঁড়ি কলসি ও শুকনো মাছের দোকানের গলিটির ফাঁকা জায়গায় বসে। শুকনো মাছ ও সবজি বিক্রেতা মহিলাদের সঙ্গে কোনোক্রমে জায়গা করে নিয়েছে। এতদিনে সবার সঙ্গে ক্রমে পরিচিত হবার ফলে মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট জায়গা নিতে পেরেছে। তার অবস্থা দেখে সবাই তাকে করুণা দেখায়। মাস খানেক এক বাচ্চা কোলে, এর একটু বড়ো পিঠে নিয়ে রোদ-বৃষ্টিতে বসে সবজি বিক্রির এই করুণ অবস্থা দেখে কেউ আর তাকে উত্যক্ত করে না । সে যেসব সবজি বিক্রি করেছে সেগুলোও দামি কিছু না, থানকুনি পাতা, কলমি শাক, নটে শাক এসব। দামি সবজি বিক্রি করেছিল সেগুলি জোগাড় করতে গিয়েও উচ্চ হারে সুদের ব্যাপারীদের কাছ থেকে ধার নিতে হয়েছে। প্রতিদিন কিছু কিছু করে পরিশোধ করার চেষ্টা করে। স্বামী তার জন্য কিছুই রেখে যায় নি। শুধু রেখে গেছে ছোটো ছোটো ছয়-সাতটি বাচ্চা- সবার ছোটোটা পেটে। এক পাল বাচ্চাদের নিয়ে অন্যের বাড়ির এক কোণে নামমাত্র ভাড়ায় আধবেলা খেয়ে কী করে যে দিন কাটাচ্ছে তা তার স্বামী দেখল না।

বয়সে যুবতী, খুব বেশি হলে তার বয়স ত্রিশ হবে। কম বয়সে বিয়ে ও পরপর এতগুলো বাচ্চা জন্ম দেওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই সে খুব রোগা। তার উপর ঠিকমতো খেতে না পেয়ে শরীরটা আরো দুর্বল হয়ে পড়েছে। রোগা ও দূবর্ল হওয়ায় একদিকে তার পক্ষে ভালোই হয়েছে বলতে হবে। না হলে এই বাজারে বিচরণরত বাঘ,

সিংহ, ভাল্লুকদের কবল থেকে নিজেকে বাঁচানো দায় হতো। কালো হলেও তার নজর কাড়ার মতো লাবণ্য ছিল। রোগা ও ময়লা , ছেড়া পোশাক পরায় এখন তা আপাতত ঢাকা পড়ে গেছে।

ছোট্ট মেয়েটার ভাগ্য ভালোই বলতে হবে, আজ তার মা গলির মুখেই বসেছে তাই মাকে খুঁজে পেতে তেমন কষ্ট হয়নি। মাকে দেখে এতক্ষণ চোখের জলের যে ক্ষীণ ধারা বইছিল তা যেন বাধঁভাঙা বন্যার মতো দু'কূল প্লাবিয়ে বইতে লাগল। মেয়ে তার দিকে ছুটে আসছে দেখে মা-ও স্বপ্ন না বাস্তব বুঝতে পারল না। সে হঠাৎই উঠে দাড়ালো।

মেয়েকে বুকে টেনে নিয়ে দু'জনেই উচ্চ স্বরে কেঁদে উঠল। সঙ্গের দোকানীদের মেয়ের দুঃখের কথা একটু আগেও কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল। শুধু আজ নয়, প্রায়ই তাদের এসব শোনাত, মেয়েটা বাড়িতে চলে আসতে চায়, তাকে নিয়ে আসার জন্য বারবার বলছে, কী করব বুঝতে পারছি না।

মা-মেয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করছে, দাঁড়িয়ে দেখছে সবাই। অনেকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করছে। তাদের দুঃখের কাহিনি সবজি বিক্রেতা মহিলারাও সমব্যথী হয়ে চোখের জল মুছছে, আর বিড়বিড় করে বলছে, 'এ করুণ দৃশ্য সহ্য হয় না।'

মেয়েটাকে যে তার মালকিন খুব নির্যাতন করেছে তা অনেক আগেই ওরা শুনেছে। 'অসম্ভব কিছু না, যা জাঁদরেল মহিলা' সবাই বলল। মেয়েটাকে ঘরের কাজের জন্য যে মহিলা রেখেছে সেই সনাতোম্বী পুলিশকে চেনে না এমন লোক এই খোয়াইম্বন বাজারে কমই আছে। তার কথা উঠলেই যে কেউ বলে উঠবে, 'আহঃ সনাতোম্বীর কথা... পুলিশ... বেহায়া। সে পারে না এমন কম্মো নেই, অন্যের স্বামীকে ছিনিয়ে নিয়ে দিব্যি ঘর করেছে।' সতিই এক এক করে চারজনের সঙ্গে সে ঘর বেঁধেছে, এখন এক ঠিকাদারের সঙ্গে ঘর করছে।

সনাতোম্বীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অনেক দিন আগে থেকেই তাকে নিয়ে আসার জন্য মা'র কাছে খবর পাঠিয়েছিল। শীতকালের ঘটানাটার পর মেয়েটা ঘন ঘন খবর পাঠিয়েছে। সেই হাড়কাঁপানো শীতের সকালে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে অতি কষ্টে চা বানিয়ে মেমসাহেবের বেড-টি বিছানায় নিয়ে দেয়। রোজই সাত সকালে মেমসাহেবের বেড-টি চাই-ই চাই। আগ্রহের সঙ্গে মেমসাহেব সাইড টেবিল থেকে বেড-টিটা হাতে নিয়ে মুখে চুমুক দিতেই তীব্র নোনতা লাগায় খেঁকিয়ে ওঠে, 'হতচ্ছারি, তোর মরা বাপকে খাওয়া গিয়ে।' বলে আগুনের মতো গরম চা-টা

মুহূর্তে মেয়েটার মুখের দিকে ছুঁড়ে মারল। বাচ্চা মেয়েতো, সাত সকালে ঘুমের ঘোরে চায়ে চিনির বদলে বোধহয় লবণ দিয়ে ফেলেছে। ভাগ্যিস, মুখটা ঘুরিয়ে নেওয়ায় গরম চা-টা শুধু বাঁ গালে অল্প কিছুটা ছিটকে পড়েছিল। তাতেই ফোসকা পড়ে ঘা হল। মা যখন মেয়েকে দেখতে গেল তখন অবশ্য ঘা ভালো হয়ে গেছে, তবে দাগটা ছিল।

এরপরও পর পর অনেক ঘটনা ঘটেছে। কাপ-প্লেট ধুতে গিয়ে একটা কাপ ভেঙে ফেলায় সারাদিন তাকে ভাত খেতে দেয়নি, বাঁশের বেড়ায় মেলে দেওয়া পেটিকোট নামাতে গিয়ে একটুখানি ছিঁড়ে ফেলেছে তো দিল বেদম পেটানি, অথবা বারান্দা থেকে বাচ্চাটা খেলতে খেলতে পড়ে গেলে...।

তবে যেদিন মেয়েটা এ বাড়িতে এসেছিল, সেদিন থেকেই সে মেমসাহেবকে প্রচণ্ড ভয় পেতে শুরু করেছিল। মা'র কথা মতো খুশি মনে তাকে 'পিসিমণি' বলে সম্বোধন করেছিল। কিন্তু সে ডাকে সাড়া না দিয়ে উলটো চোখ পাকিয়ে ধমক দিল, 'হ্যাঁ! তোর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক যে তুই আমায় 'পিনিমণি' ডাকিস? মেমসাহেব ডাকবি, বুঝেছিস। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, মেমসাহেব। ...আমি সাধারণ পুলিশ নই, বুঝেছিস– ভিলাইওয়ালা পুলিশ।'

সেদিন মেয়েটাকে নিয়ে আসার সময় তার মাকে ও-ই বলেছে, 'কোনো চিন্তা করবে না, নিজের মেয়ের মতোই রাখব, কোনো কাজই করাব না, শুধু আমার বাচ্চাটাকে দেখভাল করলেই হবে।'

কে নিজের সন্তানকে অন্যের বাড়িতে রাখতে চায় ? ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও এ কথা ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়, 'অন্তত দু'বেলা তো পেট ভরে খেতে পাবে। কাপড়-চোপড়ও দেবে বলেছে। তার উপর প্রতি মাসে দেবে পাঁচ টাকা। পাঁচ টাকা...'

মাসে মাসে পাওয়া পাঁচ টাকায় ছোটো ছোটো ছয়-সাতটা বাচ্চাকে পালতে কিছুটা হলেও সাহায্য হবে। আরো খুশির কথা তার অনুরোধে সবজি কারবারের পুঁজি হিসেবে সেদিনই পঞ্চাশ টাকা দিয়ে গেছে। হিসেব মতো দশ মাসের বেতন। কিন্তু আগাম নেওয়াতে এক বছরের মজুরি হিসেবে ধরার জন্য বলল। বেচারা মা রাজি না হয়ে পারল না।

সুন্দর ছোট্ট মানিব্যাগটা থেকে কড়কড়ে পাঁচটি দশ টাকার নোট দেওয়ায় মা খুশি হয়ে বলেছিল, 'দিদিমণি, সুখে থাকুন। সুখে থাকুন। সুখের উপর আরো সুখী হোন।'

কিন্তু মেয়ের সঙ্গে কথা করতে যাওয়ার প্রথম দিনেই বুঝতে পারল সে যা ভেবেছিল সবই ঝুট। মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে সব কথা বলল। পাড়ার লোকেরাও একই কথা শোনাল। এরপরেও যতবার মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেছে প্রতিবারই একটা না একটা নির্যাতনের খবর পেয়েছে।

মাঝেমধ্যে মেয়েকে দেখতে গিয়ে মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছে। মানুষের মনে আঘাত দিয়ে কথা বলার তার স্বভাবসিদ্ধ ঢঙেই বলল, 'এত ঘন ঘন মেয়েকে দেখতে এলে তাকে কী করে শাসন-বারণ করব? মেয়ের ঢং আর মায়ের স্বভাবে...। মেয়েটাকে মানুষ করতে চেয়েছিলাম, আর সম্ভব হচ্ছে না।'

মা মেয়েকে সান্ত্বনা দিল, 'লক্ষ্মী মেয়ে আমার, একটা বছর কষ্ট করে কোনোরকমে ...।' কথা শেষ করতে পারল না, আবেগে ভাষা হারিয়ে ফেলল।

পঞ্চাশ টাকার শেকলে হাত-পা বাঁধা। মা-মেয়ে বছর পূর্তির অপেক্ষায় সব সহ্য করে গেল। দাঁত কামড়ে পড়ে রইল। মেয়েকে দেখলে মন আরো খারাপ হয় দেখে অনেকদিন হয়ে গেল তার কাছে যায়নি। তবুও লোকেমুখে খবর পেয়ে যায়। মা'র হৃদয়ে বর্শার ফলার যেন বার বার বিঁধতে থাকে - 'মা , আমার কোমর অবধি ডুবে গেছে, মা, আমার বুক অবধি ডুবে গেছে, মাগো, আমার গলা অবধি ডুবে গেছে ...

ছোটো বাচ্চা দুটোও এসব দেখে মনে ভয় পেয়েছে। মাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করল।

কান্নাকাটি তখনো শেষ হয়নি, দজ্জাল মহিলাটি সেখানে এসে হাজির হল। এসেই বাঘিনীর মতো গর্জন করে লাফিয়ে এল, 'হ্যারে, আমাকে কী পেয়েছিস? গায়ের কাপড়টা খুলে দে। তোর কোন বাপে এটা কিনে দিয়েছে রে? আমাকে চিনতে পারছিস না ...।' এ কথা বলে মেয়েটার গা থেকে ময়লা 'ফানেক' ও জামা খুলে নিয়ে গেল। মা-মেয়ে দু'জনেই তাজ্জব বনে গেল, বোকার মত মিট মিট করে তাকিয়ে রইল। মনে মনে বেশ আহত হল।

মা'র মুখোমুখি বসা শুকনো মাছ বিক্রেতা মহিলাটির করুণা হল। এ সব ঘটনা দেখে মহাভারতের দ্রোপদীর বস্ত্রহরণের করুণ কাহিনী তার মনে পড়ে গেল। বাড়িতে কথকরা যখন এই করুণ কাহিনির বর্ণনা করত তখন সে অতি দুঃখে গলা ছেড়ে কেঁদে ফেলত, মনে হত যেন তার নিজের জীবনেই এমন ঘটনা ঘটছে। আজ এইমাত্র বস্ত্রহরণের অনুরূপ ঘটনা তার চোখের সামনেই ঘটে যাওয়ায় আর সহ্য করতে পারল না। এগিয়ে এসে কোমরে বাঁধা কাপড়ের টুকরোটা এক টানে খুলে মেয়েটার গায়ে জড়িয়ে দিল। দুঃখে রাগে গজরাতে লাগল, 'রাক্ষুসী কোথাকার,

মায়াদয়া কী একটুকুও নেই? থানার লোক বলে কি যাচ্ছে তাই ...। সবারই ঘরে স্ত্রী-কন্যা রয়েছে ! '

তারপর আবার দোকানে ঢুকে ক্যাশবাক্স থেকে কিছু টাকা নিয়ে কাপড়ের দোকানে দিকে হন হন হেঁটে গেল। দেরি করল না। একটি ছোটো ফানেক ও জামা কিনে এন মেয়েটাকে পরিয়ে দিল। অনেকটা থেমে আসা কান্নার রোল আবার বেড়ে গেল। মা-মেয়ে গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগল।

মা'র পাশে বসা সবজি বিক্রেতা মহিলাটিও তাদের এই অবস্থা দেখে বড়োই কষ্ট পেল। মেয়েটাকে একটি আধুলি দিয়ে বলল, 'নাও, একটা কিছু কিনে খাও।' তার দেখাদেখি অন্যরাও এগিয়ে এল, কেউ দিল সিকি, কেউবা আধুলি। আবার দুঃখ করে বলল, 'আহা! এক রত্তি মেয়েটাকে...। একটুকুও দয়াময়া নেই, পরজন্মে যেন কোন সন্তান না পায়।'

প্রথম প্রথম মেয়েটা পয়সা নিতে রাজি হয়নি। সবাই নিতে বলায় না নিয়ে পারল না। বাজারের ক্রেতাদেরও মা-মেয়ের এই অবস্থা দেখে এবং তাদের করুণ কাহিনি শুনে করুণা হল। সবাই এগিয়ে এসে সিকি, আধুলি এমন কি টাকা পযর্ন্ত মেয়েটার হাতে তুলে দিল। অনেকে আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে গেল, 'মাকে দিয়ে চাল কেনাবে। বাড়িতে রান্না করে ভাইবোনরা মিলে পেট ভরে খেও।'

অনেকে আবার দুঃখে ও রাগে বলে গেল, 'তোমরা সবাই কি করছিলে? সবাই মিলে দজ্জালটার চুলের মুঠি ধরে টানতে পারলো না ?'

সবার এই স্নেহমমতা পেয়ে মা-মেয়ে দু'জনে শুধু কেঁদেই চলল। এতদিন তারা ভাবত এই পৃথিবীর সব মানুষই খারাপ, দয়ামায়াহীন, নিষ্ঠুর। আজ বুঝতে পারল তারা যা ভেবেছিল, তা ভুল- পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষই ভালো, দরদি; খারাপ লোকের সংখ্যা কমই।

দূর থেকে দেখা গেল সেই দজ্জালটা এক মহিলা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে আসছে। মনে হচ্ছে আরো বেশি উত্তেজিত। তাদের দুজনকে আসতে দেখে সবাই একটু উশখুশ করে উঠল, আতঙ্কে মা-মেয়ে দুজন দুজনকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরল। মনে হচ্ছে বাচ্চা দুটোও বিপদ আঁচ করতে পেরেছে, তারাও মা'কে জাপটে ধরল।

চোখ পাকিয়ে, দাঁত কড়মড় করে ভিলাইওয়ালি পুলিশটা তর্জন গর্জন করে ধেয়ে এল, 'দেখ, মেয়েটার কি হিম্মৎ! বাচ্চা হলে কি হবে, ব্যাগ থেকে আস্ত একটি সোনার আংটিসহ কুড়ি টাকার একটি নোট চুরি করে নিয়ে এসেছে।

দেখতে পাচ্ছ, কুড়ি টাকার জলজ্যান্ত প্রমাণ হাতেই রয়েছে। কত তাড়াতাড়ি কাপড়

চোপড় কিনে ফেলেছে। অ্যাই, চল, মা-মেয়ে দুজনেই থানায়... এক্ষুনি। হতচ্ছাড়িদের জল খাইয়ে খাইয়ে পেটাব। তখনই পুলিশের দাপট বঝতে পারবি।' মুখের বিচ্ছিরি বকাবকির সঙ্গে হাত-পা'র দাবড়ানিতে এমন এক ভাব দেখালো যেন সাক্ষাৎ যমদূত এসে হাজির হয়েছে।

তার এইসব বকাঝকা আর সহ্য করা যাচ্ছিল না, পেছন থেকে একজন বলে উঠল, 'ক্ষমতা আছে বলে বেশি হম্বিতম্বি করবে না।'

'অ্যাই, কে? গাঁওয়া মেয়ে, তুই আবার আমাকে...। ' তার কর্কশ কথাটা শেষ না হতেই আরেক মহিলা বল উঠল, 'চুলের মুঠি ধরে মারো একটা টান।'

অন্য আরেকজন উসকিয়ে বলল, 'দাও একটা কষে।'

তারপর আরেকজন বলে, 'মারো তাকে ।'

'লাগাও থাপ্পড় ।'

'মারো লাথি।'

তারপর শুরু হল এক ধুন্ধুমার কাণ্ড- কিল, চড়, ঘুষি, ধুপ-ধাপ...। আশপাশের মহিলারা সবাই তাকে ঘিরে ধরে ইচ্ছেমতো চড়, থাপ্পড়, কিল, ঘুষি চালাল। চুলের মুঠ ধরে টানল।

তার সঙ্গী মহিলা পুলিশটি পরিস্থিতি সুবিধের নয় বুঝতে পেরে, 'আমি এরমধ্যে নেই, সঙ্গে আসতে বলাই এসেছি।' বলেই কোনো রকমে কেটে পড়ল। তা সত্ত্বেও সেও দু-একটা থাপ্পড় খেল।

বাজারে হাওয়াই চপ্পল ফেরি করা পাঙন (মণিপুরি মুসলিম) ছেলেটার সামনেই এসব কাণ্ড ঘটল। কাকে সবাই মিলে পেটাচ্ছে জানার জন্য উঁকি দিয়ে তাকাতেই সে দেখতে পেল, বাকিতে চপ্পল বিক্রি করতে রাজি না হওয়ায় একদিন তাকে যে মহিলা পুলিশ পিটিয়েছিল এ সে-ই। তার চক্ষুশূল সেই পুলিশটিকে সবাই মিলে পেটাচ্ছে দেখে কাঁধের চপ্পলের ঝোলাটা নামিয়ে রেখে খুশিতে হাততালি দিয়ে লাফাতে লাগল।

দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচারিত দুর্বলেরা অষ্ঠিত হয়ে একদিন সবাই একজোট হয়ে ক্ষমতাবান শক্তিকে পরাজিত করায় পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়া খুশির মতোই তার খুশিটা।

টীকা

ফানেক- মুণিপুরী মহিলাদের পরিধেয় বস্ত্র

নোংথোম্বম কুঞ্জমোহন

নোংথোম্বম কুঞ্জমোহন, জন্ম ১৯৩৫, কাছাড় আসাম। লেখা শুরু করেন তরুণ বয়সে ইলিশা অমাগী মহাও গল্পটি তাঁকে সর্বমহলে পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা এনে দেয়। বিভিন্ন সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভ্রমণ করেছেন দেশ-বিদেশ। বাংলা থেকে মণিপুরিতে অনুবাদ করেছেন *সুভাষ মুখ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশের* কবিতা। সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারের পাশাপাশি পেয়েছেন *সোভিয়েত দেশ নেহরু* পুরস্কার, সাহিত্য একাডেমির অনুবাদ পুরস্কার ইত্যাদি।

প্রকাশিত গ্রন্থ: চেনখিদ্রবা ঈচেল (গল্প, ১৯৬৫), ইলিশা অমগী মহাও (১৯৭৩), পায়রকখিদ্রে চেক্লাদো (গল্প, ২০০২), শরৎসন্ধা (উপন্যাস, ২০০২), ঐনা কেনগে কেনবা নত্তে (২০০৯) ইত্যাদি।

তিনি ২০১৪ সালের ১৯ মে ইহলোক ত্যাগ করেন।

সনাতন হামোম-এর মণিপুরি ভাষার কবিতা

অঙ্কপা পুন্সি
নুমিনা ঙাল্লিঙৈদা
মরক মরক্তা
অওয়াবা পুন্নমক লুপহল্লি এলকোহোল গী গ্লাসতা।
অওয়া- তেংথা পেন্দবা পুন্নমক
মচু নাইরবা মলেম ওনখি খুদক্তা
ভাংজুনরবা মচু মরক্তা নুমিৎসু ওনথখি থাজগী মঙার ঙক্তনা।
চাদ- থক্তনা শেল তুংশিনবা
ইনাকখুনবা মীওইশিংসু তাইবং গী অঙাংবা ইখেং
মচু মরক্তা ঙাওনৈ অমম্বা থেংনরুরগা অমম্বনা ঙক্লে।
তাইবংগী অঙকপা তাইবংসে অঙাকপানি, অঙাকপা।

বঙ্গানুবাদ

বিচিত্র জীবন
সূর্যের প্রখর আলোয়
মাঝে মাঝে
দুঃখগুলো ভূমির ঢেউ
এলেকোহেনের গ্রাসে।
সবকটি যন্ত্রণা
রঙিন জগতে পৌঁছে যায় হঠাৎ।
দুঃখগুলো গড়িয়ে যায়
লাল রঙের রঙিন আলোয়,
লজ্জায় সূর্যও গড়িয়ে যায়
চাঁদের মহিমায় অবাক হয়ে।
খেয়ে না খেয়ে সংগ্রাম করা
ধনীক মানুষেরাও
রঙিন এই আলোর বাউণ্ডুলে হয়।
অবাকের মুখোমুখি হয়েই
অবাকরাও অবাক তাকিয়ে রয়।

নিঃসঙ্গতা

পরাগ রিছিল

নিঃসঙ্গতার আরেক নাম যন্ত্রণা
ফুসলিয়ে কাছে টানতে কেউ কি
দিচ্ছে মন্ত্রণা...

হতে পারে মন্দ বাতাস-
অথবা তোর সঙ্গ চাইছি খুব
একাকিত্বে তাই এত হাঁসফাঁস।

অস্থিরতা কেবল বাইরে নয়,
অন্তরেরও ভিতরে-- নিজের
কন্ট্রোল কি, নিজেতে নাই রে?

কথাও বা বলবো কার সাথে?
কথা বলে কাজ নাই!
একা একা
বসে থাকি চুপচাপ মৌনতায়...

শালবনে লেখা কবিতা

মিঠুন রাকসাম

শালবনে
মাটির ঘরে
বেঞ্চে বসে লিখছি কবিতা
দূরে- চুনিয়া গ্রামে জনিক আচ্চুর সাংসারেক ওয়ান্না
দামার দ্রিম দ্রিম-আদুরির সুরে নেচে ওঠে শরীর-মন

কামাল জনিক সূর্যজ্বলা মোরগ ধরে প্রার্থনায় মগ্ন
কী মোহনীয় গ্রিকা! মিল্লাম-স্ফির তরঙ্গ
চুনিয়ায় সালজং সুষমী তাতারার নৃত্য
নারীকুলের গোরেরুয়া
কয়নীর গলা রাগত কোকিল কুহুকুহ সুরে গেয়ে যাচ্ছে
আজিয়া রেরে সেরেনজিং– থামার নামগন্ধ নাই!
চড়ুই পাখির মতো দখ্রু সোয়া নেচে নেচে হয়রান মালতিবুড়ি।
হায় তীরেশ!

চু মিশ্রিত লোল পড়ছে কিন্তু চাগিয়ে উঠা মান্দিসুন্দরীর স্মরণে
গেয়েই যাচ্ছে-ও আংনি খাবাকনি খাবাক...

মান্দিপাড়ার কুয়াশা কেটে কেটে হেঁটে আসছে বৃহৎনৃগোষ্ঠী গবেষক
অধ্যাপক তরুণ লেখক নবীন শিল্পী
তালি বাজাচ্ছে বুঝে না বুঝে
কোমর দুলাচ্ছে তালে বেতালে

গবেষক যারা চু মিশ্রিত লালা নিয়ে সুগন্ধি বানাতে চায় আর স্বপ্ন দেখে
প্রদর্শিত হবে দেশের প্রতিটা শপিংমলে প্রতিটা গ্যালারিতে গায়ে লেখা থাকবে
–ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর রূপরসগন্ধ মিশ্রিত...

একদল রক্ত পিয়াসী
মান্দিপ্রেমী
আসে আবিমায়
একদল যৌনপিয়াসী
মান্দিপ্রেমী
আসে আবিমায়
চু খেয়ে গোরেরুআ করে দক্রুসোয়া নাচে

সদ্যলেজকাটা কিংবা তুমুল প্রেমিকযুগল
তাদের জন্য ওয়ান্না এক দারুণ সময়

চু বিচ্চি
আদরমাখা শীত
গোলাপী নেশা
মূহুর্মূহু সঙ্গম
ডবল দান মেরে দাও...

মন খারাপ? বাও বুঝতেসো না?
বসে থাকো শালবনে
বাঘ থাকুক না থাকুক
ময়ূর আসুক না আসুক
বানর লাফাক না লাফাক
কোকিল ডাকুক না ডাকুক
বসে থাকো

বিশ্বাস রাখো মান্দির
অন্তত ওয়ান্নায় চু মিস হবে না
লেকের জল শুকিয়ে যাবে
চু শেষ হবে না।

সুজালো যশ-এর তিনটি কবিতা

অগ্রসর অশ্বনগরে

পশ্চিম রোদ ঘিরে ফেলার আগে
আমরা ফানোর সড়কে এসে নাগেশ্বরের বুকে ফুটেছিলাম...
তখনও আমাদের শরীরে পদ্যচর্চা চলছে। ঘোড়ার ছন্দে হুল্লোড় শ্যামলীমায়
যেন জুমচাঁপার দেহভাণ্ডে
রক্ত তত্ত্বের ফোঁটায় গর্জনের ঢেউ গুণে হাঁটছে তারা
দ্বন্দ্বের একেকটি জট খুলে।
এসো পাহাড়িকা শর্ষে দানা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আসি
প্রেতাত্মাদের গোপন শরীরে-
যেন সমস্ত অধীনতার শৃঙ্খল চূর্ণীভূত হয়ে
ডুবে যায় অবীচির নগরে।

প্রভাতীর ধারাপাত

শৈশবের ধারাপাত খুলে দেখুন কিছুই ঠিক নেই জানেন তো মহাশয়
বুননে ফাঁক থাকলে- ঢুকে পড়ে ভূস্বামীর যত খুলি
তবু বিনম্র গলায় টেরাকোটার ছায়া'রা বলে ওঠে আসুন,
বসুন; চাবুকিদের আতিথেয়তা গ্রহণ করুন।
পাহাড় প্রায় বলতেন- মৃত্তিকার চোখ, জলের প্রবাদ কখনো বদলায় না
এমনই আন্তরিকতা মুখর সকালে- বারবার স্মৃতিচারণ করি মাতামহীর স্বরূপকে
যিনি আমাকে বিস্ফোরণের প্রথম মন্ত্র শিখিয়েছিলেন...
সে সকল পরম্পরায়- মেগালোপলিসে মেঘের দর্শন লিখে রাখি নিজস্ব অঝাপাতে।

মৃতশ্বরের দায়

ফাল্‌গুনীর চোখে ঢুকেই দেখি
ছাতিমের হৃদয় থেকে সহস্র হারমোনিকা উড়ে যাচ্ছে
ক্লান্ত ফুলেরা ঘুমাচ্ছে সবুজাভ দৃশ্য জড়িয়ে
তাই ভাবলাম এবার অবলোকিতেশ্বর পাখি হবো পাহাড়ি নদীর সাথে
সুর মিলিয়ে বলবো দুঃখ করোনা জীবন!
এ যাবৎ যতবার গোলক ধাঁধায় পড়েছি
ততবার ঋণী হয়েছি এই বনজ কোলাহলের কাছে।

জীবন অথবা যুদ্ধ

লেবিসন স্কু

প্রকৃতির উর্বর প্রজনন
কাঁধ আর পিঠে নোয়ানো
সরল এবং মায়ার ঝুম বাগানে
মাংস লোলুপ শকুনের হানা!
একজন বাবা অথবা ভাইয়ের ভূমি হারাবার ভয়
পাহাড়ি মা অথবা বোন সম্ভ্রম হারিয়ে একান্ত অসহায়
শতবর্ষি বুড়ো গাছের আকুতি টুয়াক্কা না করে
পেরেক ঠোকে ঝুলিয়ে দেয় কোম্পানি নোটিশ
ঝর্ণার কুসুম রক্ত তীব্রতম মৃত্যুর বেদনা সরুপথে
ছুটে আসে অসংখ্য হাতুড়ি সাবল গাইতি
কর্তার নির্দেশে চলে ধূসর পাহাড় থেকে নুড়ি আলাদা
গোঙানো শুকনো পাতা আর মুমূর্ষু সোনালি পালক
নদীর পাশে করাতঘাতে পড়ে থাকে গাছবালক আর বালিকা...
তখন, আমরা মানুষ থেকে আলাদা হতে পারি না
দুই জমজ বোনো গাছকে জড়িয়ে ধরে বলি
প্রিয় দুটি গান গাওয়ার জন্য উঁচু টিলায় উঠি
দূর অচিন পাহাড়ের পাখিকে ডাকি
প্রিয় দুটি গল্প বলতে
পশুপালকে ইশারা দিই
আলাদা পারফরমেন্সে নৃত্যের ভূমিকা পালন করতে
কিন্তু তারা নিরুপায় হয়ে বলে
আমরা গল্প গান নৃত্য ভুলতে বসেছি...
তারপর, করুণ মুখে স্বপ্নময় গলায় ফিসফিস করে বলে-
আমরা তোমাদের ভালোবাসি তোমরা আমাদের প্রাচীণ বন্ধু-স্বজন
এসো কপালে চুমু খাই, হরিণ মায়া চোখগুলোয় মেঘ আঁকি
প্রিয় চুলে দুটি হাত বুলিয়ে দিই...

এখনও, প্রতি রাতে
তারা আমাদের কাছে আসে আর করুণ স্বরে বলে
প্রথমে আমাকে বেছে নাও প্রিয় বন্ধু আমার
প্রথমে তাকে বেছে নাও প্রাচীন স্বজন
সভ্য রাজার বলির বেদীতে!
আর যদি না পারো- অ্যাপ্রন পরে সাদাদূত হয়ে কী লাভ?
মানুষ জন্মে কালো পাথর ভাঙতে না হয় প্রতিরোধের পাহাড় তোলতে

খা সাংমা, খা মারাক (দিগি্গ-বান্দি)
তোমার মাশুল জোড়া মুষ্ঠিতে মৌমাছির মতো দংশন করো
পেশিবহুল বুকের গভীর থেকে আগুন স্বরে ঠোঁট নাড়াও
জিহ্বাকে দাসত্বের দিকে নিয়ে যেওনা
রুদ্ধকণ্ঠ পাপ ও বর্জের দুর্গন্ধ ছাড়া কিছুই উপহার দেবার নয়!

ধৈর্য ধরো শত জনের মাঝে মা মৌমাছিকে খুঁজো
সত্য কথা! যদি খুঁজে পাও বাকিরা বিনীতভাবে উড়ার ডানা
বন্ধুর পথে সারি সারি হাটার পিঁপড়ের নিরলস পা খুঁজে পাবে
আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে সচেষ্ট হবে! বিশ্বাস করুন
'বিশ্ব বন দিবস' আমাদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত নয়
এ মুহূর্তে যুদ্ধ অথবা মিছিলের
চেয়ে দামী কিছু আর নেই...

অনিরুদ্ধ দিলওয়ার-এর দুটি প্রেমের কবিতা

জ্যামিতিক প্রেম

নগ্নতার শরীরে উঁকি দেয় রোদ
পাশ ফিরে শোয় বিষণ্ন বোধ

মৃন্ময়ী রাত নিকটবর্তী জলে
ঘোরের প্রদেশে ঈশ্বরী ঘুঙুর দোলে

পৌরনিক ভিটায় চিত্রিত নক্ষত্র উদ্যান
প্রাসঙ্গিক সঙ্গীতে বিশ্বস্ত উরুর ঘ্রাণ

বজ্রমুষ্টি এঁকে দেয় স্তন গৃহস্থলি
নিশিচাঁদ গোল খায় মদিরায় ঢোক গিলি

হাওয়ায় বোপন করি ঈশ্বরের সিঁড়ি
প্রেমশোক রোদে যায় টান দিয়ে বিঁড়ি

প্রসন্ন চুম্বন সংজ্ঞাহীন ফ্রেমে
অদৃশ্যের দোলায় জ্যামিতিক প্রেমে।

পরকীয়া

রেঁস্তরায় চা-পান করতে করতে কাপ হয়ে যায় প্রেমিকা– ঠোঁটের মৃসন ভাজ হতে চুম্বন উড়ে আসে বসন্ত তালুতে। চিহ্ন রেখায় রেলগাড়ি ছুটে চলে কু-ঝিকঝিক আয়ু নিয়ে। বেঁচে থাকার আনন্দে কেক কাটায় সরগরম শহরময়। লাভ রিকেক্ট জমা হলে নেচে উঠে শতবর্ষী রাজহাঁস। তরঙ্গিত যৌবন হেসে ওঠে। স্বমেহন পর্বের পর সমুদ্র স্রোতে ভাসে সফেত ওড়নার ঘ্রাণ। সূর্যতাপ ইঁদুর গন্ধ শুকতে গিয়ে বিলিন হয় সঞ্চিত আহ্লাদ। পিরামিড উচ্চতায় পাহারায় থাকে শ্বশুরের মেয়ে। আর আমি পাসপোর্টের মেয়াদ বাড়াতে ধর্না দেই এ পাড়ায় ও পাড়ায়।

আর্য্যমিত্র চাকমা'র দুটি কবিতা

যুগর্ সুদোম্

কনে কি ক'র্, গম্ না বজং
দার্দারি নেই, অহ্য় উগুধ
ইয়ানই এ যুগর্ সুদোম্, গম্,
ন অহব্ কিত্যা? অহ্লে-
কার মাধাত্ কি দেবা ভাঙি পরে?
জদবদে কি সেত্যে সেত্যে!
হামরত্ নয়্, হামরত্ নয়,
ইয়ানই সুদোম্, ইয়ানই নিয়ম।
একজনে ডেইনে খুচ্ বারেলে
আর একজনে বারেব বাঙে,
জু পেলে গজাং গজাং যেব
একঝাক্ যেবাক্ আর উগুরে
তে কি অহ্দ, কি অহ্ব্ ?
ইয়ানই যুগর্ দচ্তুর্
ইয়ানই সুদোম্, ইয়ানই নিয়ম।
কনে কি ভাবের, গম্ না বজং
সিয়ানে কি খজক্?
আমনর্ ঈল্ ফুদিলে ওল্
আরি পেলে দচ্গুন্ যানা
জু পেলে আর দিয়েনা
ইয়ানই এ যুগর্ দচ্তুর্
ইয়ানই সুদোম্, ইয়ানই নিয়ম।
জু পেলে ভারানা, চুগুলি গরানা
ভালেদর্ কামত্, উজোন্দি পধত্-
আর্ ন দিলে কেনে?
ন অহ্লে মানেইয়র্ চিন্দাবাচ্ ধায়!
ইয়ানই যুগর্ দচ্তুর্
ইয়ানই ইরুক নিয়ম।
এ দিনোর্ পিথিমিত্-
জিংকানি অমকদ অভেলর্
চিত্নেইয়্যার্, অদংকরলর্
ইনজেব্ নেইয়্যার, বারাবাজ্যার
সাত্বেজা খিইয়্যার্।
ইরুক গোজেনর্ এ সিরিচ্তি-
ভাঙন্দির, ছারানাদার্
পহ্রয়ান্ যিয়ে সিধেনেন্দি
বেগর্ পিজোর কুন্ উত্যে-
কবালত্ ধুদুরো ফুল ফুত্যে
লাগর পোয়াবো বেনালে যিয়্যা
উজুনো কুরোবো ডাক্ কাজ্যে,
আমা দঝনত্ ইয়ানই লেবেদেয়্যা,
চেই ন চেই, ইয়ানই পিয়েই,
আমি মানি কি ন মানি!
ইয়ানই যুগর্ দচ্তুর্
ইয়ানই সুদোম্, ইয়ানই নিয়ম।

বঙ্গানুবাদ

যুগধর্ম

কে কী বলছে, ভাল কি মন্দ
সেটা গ্রাহ্যহীন, হচ্ছে বিপরীত
এটাই এ যুগের রীতি, সেটাই উত্তম
হবে না বা কেন? যদি হয়-
সেজন্য সত্যি সত্যি কি
কার মাথায় বা আকাশ ভেঙে পড়ে।
কখনও নয়, কখনও নয়,
এটাই এখন রীতি, এটাই শৃঙ্খলা।
একজন যদি ডানে এগুতে চায়
অন্যজন এগুবে বামদিকে -
সুযোগ পেলে দৃঢ় পদক্ষেপে আর হাঁটবে
একঝাঁক আর অধিক পা দেবে
তাতে কী বা হবে, কী বা হচ্ছে?
এটাই এ যুগের সংস্কৃতি
এটাই এ যুগের শৃঙ্খলা
কে কী বলছে, ভাল বা মন্দ
তাতে কী বা আসে যায় ?
নিজের তৃপ্তি স্বস্তি হলে হয়
কায়দা পেলে আরও দশগুণ যাবে
সুযোগ পেলে আরও ডিঙাবে
এটাই এ যুগের সংস্কৃতি-
এটাই রীতি, এটাই শৃঙ্খলা।
সুযোগ পেলে প্রতারণা, চালাকি করা
মঙ্গলের কাজে, উন্নতির পথে
কেউ বাধা না দিলে কি হয়?
না হলে মনুষ্যত্ব যেন থাকে না!
এটাই এ যুগের সংস্কৃতি-
এটাই এ সময়ের শৃঙ্খলা।
এ সময়ের পৃথিবী যেন বেশৃঙ্খলার
হৃদয়হীনদের, গোঁয়ারদের,
বিবেকহীনদের, বাড় বাড়ন্তদের
ধূর্ত-শঠ ছলবাজদের।
এখন সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি-
হতাশার, শ্রীহীন, জীর্ণশীর্ণ
আলো (জ্ঞান) আড়ালে চলে গেছে
সব অস্বাভাবিকতার অনাসৃষ্টির
সবাইয়ের কপালে ধুতুরাফুল ফুটেছে
গুণধর ছেলেটা বিপথে পা ফেলেছে
সব অসামঞ্জস্যতার, অস্বাভাবিকতার
আমাদের ভাগ্যে এটাই এঁটে আছে।
আমরা চাই, না চাই
এটাই আমরা পেয়েছি,
মানি কি না মানি
এটাই যুগের সংস্কৃতি
এ যুগের রীতি, শৃঙ্খলা।
(ধুতুরা ফুল- অমঙ্গলের প্রতীক)

মাত্তর- ইক্কু নেই

উই ছিগোন্ ছরায়ান্ মর্ মা সান্
ছরা দি ধাগত্ তারুম্ এল
তারুম কুরে ঝরঝরি এল
তারুমত্ পেগো কলকলি এল,
পত্তাপত্তি, পুগোর্ তামজা এল,
পেগোর্ কান্সুক্ গিত্ এল,
এক্ ঝাক্ এমানর্ দবদভা এল,
ভালুগর্, বাঘর্ গুজুরনি এল,
মনত্ ভজান্ সুক্ এল,
মাত্তর- ইক্কু নেই।

তারুম এ্যাদেদি ভরন্দি আদাম এল,
ভরন্দি আদামত্ মর্ ঘর্ এল,
ঘরে ঘরে মেয়্যেদলা এল,
চিদোমুরোর্ কোচ্পানা এল,
কান্সুক্ পচ্চন এল, বারমাস্ এল,
গেংখুলির্ উচ্চোর্ রেইং এল,
বিজগর্ জিদানার্ কিত্যা এল,
মর্ পাদা রঙর্ সোচ্ সবন্ এল,
মাত্তর- ইক্কু নেই ।

উই, তারুমত্, মোনত্ মর্ দবদভা এল,
মুরোত্, কলগত্, সাভাগত্ মর্ রাজত্তি এল,
ও, মাদি সমারে মর্ রণ্দুক্ এব মিঝি আঘে,
ও, মাদি কলইয়োত্ মর্ সবন্,দুক্ লেবেদে আঘে,
সিদু মর্ জিংকানির কবিদ্যে এব লেখ্যে আঘে,
মর্ সেরা উপন্যাসচো সিদু এব এগোর্ ওগোর্ খায়্,
জিংকানির লারেইয়র্ বিজোক্ এব সিদু ভাঝি বেরায়,
ইক্কু বেক্ অলেখন্, আরাচাগত্, বানা চোক্ পিজেনি,
মুই্ উরোন্, মাত্ আহ্রা, আগে বেক্ এল,
মাত্তর- ইক্কু নেই।

বঙ্গানুবাদ

কিন্তু- এখন নেই

ঐ ছোট ছড়াটা আমার মায়ের মতন
ছড়ার দু'পার্শ্বে গভীর বন ছিল
বনের নিকটে ঝর্ণা ছিল,
পাখ-পাখালির কলরব ছিল
প্রজাপতি, পতঙ্গের নাচানাচি ছিল,
পাখির সুমধুর গান ছিল,
এক ঝাঁক জীবের দাপট ছিল
বাঘ ভালুকের গর্জন ছিল
আমার মনে অনেক শান্তি ছিল
কিন্ত- এখন আর নেই।

বনের ভাটি দেশে বড় গ্রাম ছিল
ঐশ্বর্যশালী গ্রামে আমার ঘর ছিল
ঘরে ঘরে স্নেহ মাখা ছিল,
হৃদয়ের গভীরের ভালোবাসা ছিল,
শ্রুতিমধুর বৃপকথা ছিল,
গেংখুলি গীতের আনন্দ-উচ্ছ্বাস ছিল
ইতিহাসের জয়ের অনেক কাহিনি ছিল,
আমার অনেক সবুজ রঙের স্বপ্ন ছিল,
কিন্ত- এখন নেই।

ঐ বনে, পাহাড়ে, আমার প্রতিপত্তি ছিল.
পাহাড়ের ঢালুতে, সমতলে আমার রাজত্ব ছিল,
ঐ মাটির সাথে আমার শ্রম মিশে আছে,
মাটির অণুতে আমার স্বপ্ন, কষ্ট জড়িয়ে আছে,
সেখানে আমার জীবনের কবিতা লেখা আছে,
আমার রচিত সেরা উপন্যাসটি এখনো সেখানে গড়াড়ড়ি দে,
আমার জীবন সংগ্রামের ইতিহাস এখনও সেখানে বাতাসে ভেসে বেড়ায়,
এখন সব অবহেলায়, আস্তাকুরে, আমাকে আড় চোখে দেখে,
আমি নিঃস্ব, আমি বাক্রুদ্ধ, আগে সব ছিল
কিন্ত- এখন নেই।

আদিবাসী লেখকদের সাহিত্যচর্চা বিকাশে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক: লিটলম্যাগ 'থকবিরিম' এবং 'কথা'-এর যৌথ উদ্যোগে আদিবাসী লেখকদের অংশগ্রহণে এক লেখক কর্মশালা ও ভাবনা বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৬ জুন রাজধানীর ঢাকা ক্রেডিট-এর হলরুমে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালায় অতিথি প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক এহসান মাহমুদ। আলোচক হিসেবে অংশ নেন আদিবাসী গবেষক বাঁধন আরেং এবং লেখক থিওফিল নকরেক। বিভিন্ন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রায় ২৫ জন লেখক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। সকাল ১০টায় শুরু হওয়া কর্মশালাটি দুপুর ২টায় শেষ হয়।

সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক এহসান মাহমুদ বলেন, আদিবাসী ভাষাকে টিকিয়ে রাখতে হলে সেই ভাষায় নিয়মিত লেখালেখি করতে হবে। কবিতা, গল্প, উপন্যাসসহ বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি করতে হবে। বর্তমান সময়ে বিভিন্ন ভাষার প্রভাবের মধ্যে নিজেদের মাতৃভাষার চর্চা আরও বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, শুধু সাহিত্য নয়, দৈনন্দিন জীবনের বার্তা আদান-প্রদান, এমনকি প্রেমের কবিতাও মাতৃভাষায় লেখা উচিত। তিনি সারা দেশের আদিবাসী সাহিত্যিকদের নিয়ে একটি জাতীয় আদিবাসী সাহিত্য সম্মেলন আয়োজনেরও পরামর্শ দেন।

আদিবাসী গবেষক বাঁধন আরেং বলেন, সৃজনশীল লেখালেখির জন্য কর্মশালা অপরিহার্য না হলেও সাংবাদিকতা ও গবেষণার ক্ষেত্রে কর্মশালার গুরুত্ব রয়েছে। তিনি তরুণ

লেখকদের মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব উপলব্ধি করে আরও সচেতন ও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানান। লেখক থিওফিল নকরেক বলেন, আদিবাসী লেখকদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রাখতে পারস্পরিক যোগাযোগ ও নিয়মিত মতবিনিময়ের পরিবেশ গড়ে তোলা জরুরি। এ লক্ষ্যে তিনি লেখকদের নিয়মিত মিলিত হওয়ার আহ্বান জানান।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সিলেটের লেখক সনাতন হামোম কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, এ ধরনের কর্মশালা একদিনের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদি হওয়া উচিত এবং শুধু ঢাকায় নয়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আয়োজন করা প্রয়োজন। কর্মশালার সমাপনী পর্বে অংশগ্রহণকারী লেখকেরা নিজেদের ভাবনা ও অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। পাশাপাশি নিয়মিত যোগাযোগ ও সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রাখতে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

রান্নাঘরের নৃ-তত্ত্ব ও কৃষ্টির রসায়ন: মিঠুন রাকসামের

গারো জাতির পানীয় ও খাদ্য বৈচিত্র্য

তৃপ্ত মানখিন

কোনো একটি নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনদর্শন, কৃষ্টি, জলবায়ু এবং ভৌগোলিক অস্তিত্বকে বুঝতে হলে তাদের চিরাচরিত ঐতিহ্যবাহী রান্নাঘরের দিকে তাকানো অত্যন্ত জরুরি। কবি ও গবেষক মিঠুন রাকসামের 'গারো জাতির পানীয় ও খাদ্য বৈচিত্র্য' কেবল একটি রন্ধনপ্রণালীর বই নয়; এটি মূলত বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসী গারো বা মান্দি সমাজের হাজার বছরের বেঁচে থাকার সংগ্রাম, ঐতিহ্য ও প্রকৃতির সাথে মিতালির এক অসাধারণ সামাজিক ও নৃ-তাত্ত্বিক প্রামাণ্য দলিল। ছিমছাম তথ্যবহুল এই বইটির প্রতিটি পাতা উল্টালেই পাঠক হারিয়ে যাবেন একটি জাতিসত্তার ভেতরের এক আদিম ও খাঁটি কৃষ্টির সুবাসে।

আত্মপরিচয়ের শিকড় ও ভৌগোলিক বিন্যাস

লেখক গ্রন্থের সূচনালগ্নেই মেজর এ. প্লেফেয়ার এবং রবিন্স বার্লিং-এর মতো বিখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানীদের ঐতিহাসিক সূত্র ধরে প্রমাণ করেছেন যে, কিরাত বা মঙ্গোলীয় জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এই মান্দিরা আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে তিব্বত থেকে হিমালয় পর্বতমালা পেরিয়ে প্রথম এই উপমহাদেশে পা রেখেছিল। এরপর তারা ব্রহ্মপুত্র নদের তীর ধরে আসামের কামরূপ হয়ে কীভাবে নেত্রকোনা, টাঙ্গাইলের মধুপুর গড়, শেরপুর এবং ঝিনাইগাতীর সীমান্ত অঞ্চলে নিজেদের বর্ণাঢ্য বসতি ও লোকসংস্কৃতি গড়ে তোলে, তার একটি চমৎকার ভৌগোলিক বিন্যাস এখানে পাওয়া যায়।

'চু' সংস্কৃতির সামাজিক ও আধ্যাত্মিক গুহ্য দর্শন

গ্রন্থের 'পানীয়' পর্বে লেখক স্পষ্ট দেখিয়েছেন যে, গারো লোকজীবনে প্রথাগত ঐতিহ্যবাহী ধেনো মদ বা 'চু' কেবল একটি সাধারণ পানীয় নয়, বরং তা তাদের কৃষ্টি ও শিষ্টাচারের অপরিহার্য অংশ। ওয়ানগালা (নবান্ন), মিমাংখাম (শ্রাদ্ধানুষ্ঠান) থেকে শুরু করে বিচার-সালিশ চু ছাড়া তাদের কোনো সামাজিক উৎসবই পূর্ণতা পায় না। বিন্নি ধানের ভাত দিয়ে তৈরি হালকা মিষ্টি 'চু মান্দে' এবং বাষ্পীভূত কড়া 'চু কচ্চাং'-এর প্রস্তুত প্রণালী লেখক অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। তবে

সবচেয়ে চমকপ্রদ অধ্যায়টি হলো 'চু জাঙ্গি' বা জীবনমদ, যা নতুন সন্তানের জন্মের একমাস আগে থেকে তৈরি করা হয় এবং নবজাতকের ঠোঁটে ও মায়ের ব্যথানাশক হিসেবে ওষধি উপায়ে ব্যবহার করা হয়, যা এক কথায় এক অনন্য জাদুবাস্তবতা। বলা যায় 'চু' সংস্কৃতি ভিন্ন জাতির সংস্কৃতি হতে এক অন্যন্য সংস্কৃতি।

ক্ষারি জাবা ও নাখাম-বিচ্চির খাদ্য-নন্দনতত্ত্ব

গারোদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় তেল-মসলার আধুনিক আগ্রাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে কীভাবে তারা সোডা বা ক্ষারের সাহায্যে 'নাখাম ক্ষা রি' (শুটকির ক্ষার) বা 'ওয়াক-ফুরা' (আতপ চালের গুঁড়া, বিভিন্ন বনজপাতা ও শূকরের মাংসের ক্ষার) তৈরি করে, তার এক লোভনীয় রসায়ন বইটিতে বর্ণিত হয়েছে। কলাগাছের মোথা পুড়িয়ে ছাই করে চিরাচরিত পদ্ধতিতে 'ক্ষারবিচ্চি' (ক্ষারের নির্যাস) তৈরির প্রক্রিয়াটি তাদের আদিম বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিমত্তাকে নির্দেশ করে। এছাড়া পুঁটি মাছকে মাটির মটকা বা বাঁশের চুঙ্গায় সরিষার তেল দিয়ে দীর্ঘদিনের ফারমেন্টেশনের মাধ্যমে তৈরি 'নাখাম জাগুয়া' (বাঙালিদের হিদল শুটকি) কীভাবে তাদের রান্নার মূল স্বাদ এনে দেয়, তা খুব সুন্দরভাবে উঠে এসেছে।

প্রকৃতির অরণ্য থেকে কুড়িয়ে আনা আহার

এই গ্রন্থের সবচেয়ে বড় বৈচিত্র্য হলো বুনো শাকসবজি ও প্রকৃতির উপাদানের ওপর মান্দিদের নির্ভরতা। পাহাড়ি বাঁশের কচি কোড়ল 'মি-আ', বুনো মাশরুম 'দামবং', টক জাতীয় 'মেনদা চুক্কা', কলাপাতা দিয়ে কয়লার আগুনে পুড়িয়ে রান্না করা 'হুটেপা/হুগেবা' এবং বাঁশের চোঙ্গায় রান্না করা 'ব্রেংআ' পদ্ধতির বিবরণ ভোজন রসিক যেকোনো আধুনিক পাঠককে বিমোহিত করবে। একই সাথে রোগবালাই দূর করতে তিতা জাতীয় খাবার যেমন শুকনা পাটপাতা বা 'নাইলা গ্রান', বুনো ফল 'খিমখা' এবং পুকুরপাড়ের 'ডিমাতিতা', আলত বিবাল/আলত, পেঁপে ফুল ও কচিপাতা খাওয়ার লোকজ বিশ্বাসও বইটিকে চমৎকার সমৃদ্ধ করেছে।

এই গ্রন্থে মিঠুন রাকসাম নিজে গারো জাতিসত্তার লেখক হবার সুবাদে গারোদের নিজস্ব রন্ধনপদ্ধতিতে নিজস্ব খাদ্যতালিকা এবং রন্ধনকৌশল সুনিপুণভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন।

তবে লেখক বইটিকে আরো বড় করতে পারতেন বিশেষ করে খাদ্য তালিকায় গারো জাতির নিজস্ব পিঠাপুলির কথা লিখতে পারতেন। পুরো বইটিতে আমি গারোদের নানাধরনের পিঠাপুলির কথা কিংবা রন্ধনপ্রণালীর কৌশল অভাববোধ করেছি। মিঠুন রাকসামের 'গারো জাতির পানীয় ও খাদ্য বৈচিত্র্য' বইটি কেবল একটি নৃ-তাত্ত্বিক বই

নয়, এটি বৈশ্বিক সংস্কৃতির করাল গ্রাসে হারিয়ে যেতে বসা আমাদের সমতলের অরণ্যের নিজস্ব রন্ধনশিল্প ও লোকঐতিহ্যকে নথিবদ্ধ করার এক ঐতিহাসিক সুরক্ষাকবচ। রাজীব দত্তের নান্দনিক প্রচ্ছদ এবং তিউড়ি প্রকাশনীর এই অনবদ্য উদ্যোগের কারণে বইটি বিশ্বসাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান এবং কৃষ্টিপ্রেমী প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে একটি আকর গ্রন্থ হিসেবে স্থান পাওয়ার দাবিদার।

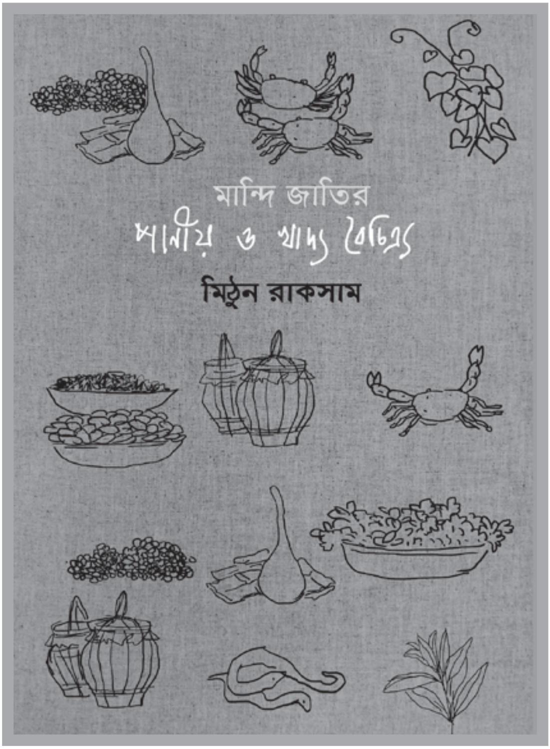

গ্রন্থ পরিচিতি:
বইয়ের নাম: গারো জাতির পানীয় ও খাদ্য বৈচিত্র্য
লেখক: মিঠুন রাকসাম
ধরণ: নৃ-তাত্ত্বিক ও লোক-সংস্কৃতি গবেষণা
প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ২০১৭
প্রচ্ছদ: রাজীব দত্ত
প্রকাশক: তিউড়ি প্রকাশন, ঢাকা
বিনিময় মূল্য: ১৩৫ টাকা মাত্র।

আদিবাসী লেখকদের প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থসমূহ